ISSN 2227-1635
**বাঙলা সাহিত্যিকী** ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

# মাহমুদুল হকের উপন্যাস: নিঃসঙ্গ জীবনের রকমফের

*ড. নূর সালমা খাতুন

**সারসংক্ষেপ:** বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে কথাশিল্পী মাহমুদুল হক এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁর প্রথম দিককার বেশ কয়েকটি রচনা পাঠকের নজরে না এলেও, পরবর্তীতে রচিত তাঁর উপন্যাস বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। বিপুল বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তাঁর উপন্যাসগুলোতে জীবনের বিচিত্র ধারার প্রতিফলন ঘটেছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস *অনুর পাঠশালা* থেকে শুরু করে শেষ উপন্যাস *পাতাল পুরীতে* মানুষের নিঃসঙ্গ জীবন ও যন্ত্রণার ক্লেদাক্ত ছবি অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক। আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত মানুষের নিঃসঙ্গ জীবনবোধের সেই চালচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সাহিত্যে কথাশিল্পী মাহমুদুল হক (১৯৪১-২০০৮) একটি বিশিষ্ট নাম। একটি কিশোর উপন্যাসসহ নয়টি উপন্যাসের স্রষ্টা মাহমুদুল হক। যদিও লেখক মাহমুদুল হকের শুরুটা হয় ১৯৫৩ সালে "দুর্ঘটনা" গল্পটি দিয়ে। এরপর সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মাহমুদুল হক ১৯৫৪ সালে লেখেন *রেডহর্নেট* নামে একটি ডিটেকটিভ উপন্যাসসহ *অরণ্য বাসর*, *আমি সম্রাট* নামে আরো দুটি উপন্যাস। এর কয়েকবছর পর ১৯৫৮ সালের শেষ দিকে উপন্যাস *ব্যাধ ও নীল দুপুর* লেখা শুরু করেন। কিন্তু এটা শেষ করার আগেই লিখে ফেলেন *দ্রৌপদীর আকাশে পাখি* নামে আরেকটি উপন্যাস। এসময় *এলাকা* নামেও একটি বৃহৎ উপন্যাস রচনায় হাত দেন মাহমুদুল হক। এ লেখাগুলোর নাম ছাড়া আর কিছু পাওয়া আজ অসম্ভব হলেও এই লেখাগুলোর ইতিহাস জানা যায় তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে।[১] বহুবিধ কারণে এগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। আর পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে মাহমুদুল হক বলেন:

> ...একদিন সব ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে (বোধহয় বাড়ি বদলেয় সময়) সমাপ্ত-অসমাপ্ত সব লেখাই এত জোলো, এমন অর্থহীন, এমন ছেলেমানুষি মনে হল যে ফেলে দিলাম সব। প্রতিজ্ঞা করলাম সব ভুলে যাব, এসবের সঙ্গে আর জড়াব না নিজেকে।[২]

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত টেকে নি। বছর তিনেকের বিরতির পর ফিরে আসেন লেখার জগতে। গল্প দিয়ে শুরু এই যাত্রা। এরপর একে একে নয়টি উপন্যাস লিখে ফেলেন। এগুলো হলো : *অনুর পাঠশালা* (১৯৬৭), *নিরাপদ তন্দ্রা* (১৯৬৮), *জীবন আমার বোন* (১৯৭২), *কালো বরফ* (১৯৭৭), *মাটির জাহাজ* (১৯৭৭), *খেলাঘর* (১৯৭৮), *অশরীরী* (১৯৭৯), *পাতালপুরী* (১৯৮১) এবং *চিক্কোর কাবুক* (১৯৭৯)।

মাহমুদুল হকের লেখা শুরুর পর্বটা এই জনপদের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ উন্মাদনায় ভরা একটা সময়। একটা জাতি তার জন্মের ইতিহাস তৈরিতে উন্মুখ। '৪৭-এর দেশবিভাগের পর মাহমুদুল হক সপরিবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঢাকায় চলে আসেন বাবার ইচ্ছায় আর মায়ের প্রবল অনিচ্ছায় ১৯৫১ সালে। আর এদেশের ইতিহাসে ঠিক এসময় থেকেই ঘটে যায় একে একে অনেকগুলো না-ভোলার মত ঘটনা। ১৯৫২, ৬২, ৬৬, ৬৯, ৭০, ৭১ এই সালগুলো বাঙালি জাতির জীবনে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে যায়। সবই ঘটে মাহমুদুল হকের চোখের সামনে। রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ঢাকাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নতুন এক

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ গভ: ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী

রাজধানী। এই নাগরিক জীবনে মানুষের অভ্যস্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা, পুঁজিবাদী সমাজের প্রকোপ বেড়ে যাওয়া আর এর ফলে কোনো কোনো ধনীর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে মিশে যাওয়া এবং কোনো কোনো কৌশলীর আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাওয়া, যৌথ পরিবারের ভাঙন, একক পরিবারের আধিপত্য, বিচ্ছিন্নতাবোধ তথা ব্যক্তিমানুষের উন্মূলতা, নিঃসঙ্গতা এবং সময় ও ইতিহাস নিয়ে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ও সংকট—এসবই মাহমুদুল হক দেখেন, বোঝেন, অনুভব করেন এবং চেতনায় গ্রহণ করেন। লেখালেখি ছেড়ে দিয়ে পারিবারিক স্বর্ণ-ব্যবসায় নামলেও লেখালেখি মাহমুদুল হককে ছেড়ে যায় নি। সমাজ ও মানুষকে দেখার যে সহানুভূতিসম্পন্ন এবং নিরীক্ষাপ্রবণ দৃষ্টি তাঁর ছিলো সেটাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে লেখালেখিতে।

মাহমুদুল হকের কয়েকটি উপন্যাসে বিষয়গত অভিন্নতা থাকলেও প্রকাশভঙ্গির স্বকীয়তায় তা ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস নিছক কাহিনির উপস্থাপনা নয়, তিনি বেছে নেন চরিত্রের ভেতরের অন্তর্কথনকে অর্থাৎ মনস্তাত্ত্বিক হৃদয়বৃত্তির উদ্ভাসন ঘটান লেখায়। জীবন সম্পর্কে মাহমুদুল হকের ঘোষণা, 'জীবন অনেক বিরাট ব্যাপার, বিশাল তার অবয়ব। কিন্তু একটা স্টেজে এসে প্রত্যেক মানুষই আবিষ্কার করে সে ব্যর্থ।'[৩] এরকম দার্শনিকবোধে সিক্ত মাহমুদুল হক মনে করেন জীবনের খণ্ডিত রিপুগুলো এসেছে তাঁর উপন্যাসে এবং জীবনের বড় ঢেউয়ের চেয়ে ছোট ঢেউগুলোকে তুলে ধরেছেন লেখায়।[৪] এক নিস্পৃহ নিরাসক্ত ভঙ্গিতে '৪৭-এর দেশবিভাগ, মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে মধ্যবিত্তের জটিল জীবনকে রূপায়িত করেন মাহমুদুল হক। তিনি সমাজ-সময়-সমকাল-দেশ-রাজনীতি সবকিছুকেই লেখার বিষয়বস্তু করেন। এতে ভিন্নতা নেই বললেই চলে। তবে ভিন্নতা রয়েছে অন্যখানে—সেটা হলো দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি জীবনকে দেখেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে, গভীর অনুসন্ধানী মন নিয়ে। আর লেখায় ফুটিয়ে তোলেন ব্যক্তির মনোজগতের রহস্যময়তা, হৃদয়ের টানাপোড়েন, সমাজের অনেক অনভিপ্রেত সত্যকে। 'প্রকৃত সংবেদনশীলতার অধিকারী লেখকই যথাপ্রাপ্ত জীবনে সন্তুষ্ট না থেকে তাকে পুনরাবিষ্কার করতে চান।'[৫] মাহমুদুল হকের লেখাতেও সেই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

*অনুর পাঠশালা* গ্রন্থাকারে মুদ্রিত এবং আমাদের প্রাপ্ত মাহমুদুল হকের প্রথম উপন্যাস। রচনাকাল জুলাই ১৯৬৭। উপন্যাসটি শুরু হয় বিনয় মজুমদারের কবিতার পাঁচটি লাইন দিয়ে। নাগরিক পটভূমিতে লেখা চরিত্রপ্রধান এই উপন্যাসের আখ্যান গড়ে ওঠে কিছু অভিজাত মানুষ, কিছু বস্তিবাসী এবং ঋষিপাড়ার কিছু মানুষকে নিয়ে। গ্রীষ্মের এক দুপুরে ধনী বাবার বিশাল বাড়িতে একাকী ছটফট করা বিষণ্ন কিশোর অনুর কথা দিয়ে গল্প শুরু। দোতলা বাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীকে দেখে অনু। সেখানে আছে লামাদের বাগান, পাড়া-বেপাড়ার দস্যু ছেলেদের ব্রিং খেলা, তাদের খুচরো খুচরো ঝগড়া, আলগা মারপিট এবং পাশাপাশি আছে জলেশ্বর মালী আর মালীবৌ। লেখকের ভাষায়:

> কোনো কোনোদিন মালীবৌয়ের বুকে মুখ গুঁজে নিসাড় টান হয়ে পড়ে থাকে জলেশ্বর মালী। মালীবৌয়ের বুক শাদা ধবধবে। অনেকক্ষণ ধরে ঘুমোয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত বেলা পড়ে না আসে—হাতে পাওয়ার মতো গাছের নিচে পাউডার-পাফ কোমল সূর্য ঝুলতে থাকে। অনুর কি কোথায় সব মনে হয়; ওদের ঘরের মেঝে খুব ঠাণ্ডা, গাল পেতে শোয়া যায়, অগোচরে বুক ভরে নিশ্বাস নেওয়া যায়।[৬]

অনুকে উচ্চবিত্তের বিলাসবহুল জীবনের উপকরণগুলো তেমন একটা টানে না। যেখানে আছে বাবা-মার অসহনীয় ঝগড়া, ইংরেজি স্যারের কাছে সারা দুপুর ঘরের দরজা বন্ধ করে মায়ের অবিরাম ইংরেজি শেখা—এরকম একঘেয়ে জীবন থেকে অনু মুক্তি খোঁজে কিন্তু তার বাড়ির বাইরে বেরুনো বারণ। মা বলে, 'ঐসব হাঘরে ইতরদের সঙ্গে তোর অনেক তফাৎ, ...।'[৭] অনুর এই বারণ মেনে নিতে কষ্ট হয়, উপেক্ষা করার চেষ্টা করে। দুপুরে অনুর কিছু করার থাকে না। মা ক্লান্তিহীনভাবে একতলার কোণের ঘরে ইংরেজি শেখে। অনুর মনে হয় এই সময় মায়ের 'তার সঙ্গে যেন নিদারুণ শত্রুতার এক সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়।'[৮] সে ভাবে, 'মা কোনো এক মরা নদী। ইচ্ছেরা সব জলেশ্বর মালী। ইচ্ছেরা সব এক একটা চন্দনের পুরানো কৌটো।'[৯] আর বাবাকে সে, 'সহ্য করতে পারে না। শয়তান মনে করে। ঘৃণা করে।'[১০] দুপুরে কী করবে ভেবে না পেয়ে অনু যখন শিউরে ওঠে তখন তার 'বুকের মাঝখানে কাচের নীল পিরিচ ভেঙে খান-খান হয়ে যায়।'[১১] তখন পাঠকের বুঝতে 'আর অবশিষ্ট থাকে না অনুর গভীরতর চেতনায় ঔপন্যাসিক এক সুলুকসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।'[১২] দেখান কিশোর অনুর চেতনা যাপিত জীবনের জটিল আঁকিবুকিতে ভরা। যা গভীরভাবে পাঠকসত্তাকে আন্দোলিত করতে থাকে আর *অনুর পাঠশালা* একটি কিশোর উপন্যাস না হয়ে বড়দের উপন্যাস হয়ে পড়ে। উপন্যাসের মাঝামাঝি এসে দেখা যায় অনু মায়ের বারণ উপেক্ষা করে 'দুপুরের উদ্দেশে নিজেকে অবাক করে নিরুদ্দেশ হলো।'[১৩] অনু জানালা দিয়ে দেখা সেই পাড়া-বেপাড়ার ছেলেদের দলে ভিড়ে গিয়ে ওদের জীবনের আনন্দ ভাগ করে নিতে চায়। কাজটা কঠিন তবু সে চেষ্টা চালিয়ে যায়। যখন ফকিরা, টোকানি, গেনদু, লাটু, মিয়াচাঁন, ফালানিরা অসহ্য হয়ে উঠে তার কাছে কিংবা তাদের কাছে অনু ঠিক তখন সে 'আশ্চর্য রূপময় এক জগৎ'-এর দেখা পায়। ঋষিপাড়ার মেয়ে সরুদাসী। তারই সমবয়সী। এর অনর্গল বলা কথা অনুকে মুগ্ধ করে। সরুদাসীর সঙ্গে অনুর কাটে একটি মাত্র প্রহর—যেটা উপন্যাসের সতেরোটি পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে। বাস্তবের নির্মমতায় আহত অনু সেখানে অন্য এক জগৎ খুঁজে পায়। পাঠকও মুগ্ধ হয়ে যায় সরুদাসীর মান বাংলায় বলা কখনো পরিপক্ব সাংসারিক কথায় যেমন : 'চারমানবাবুর ছোটো মেয়েটার না বিয়ে না হতেই পেট হয়েছে।'[১৪] কখনো দার্শনিকের মত গভীর জ্ঞানের কথায় যেমন : 'পায়ের সেবা করলেই মাথা পাবি, মাথার মধ্যেই সব, মাথার মধ্যে বিশ্ব!'[১৫] অতি সাধারণ বিষয়ও সরুদাসী সুন্দর করে বলে। প্রকৃতির রূপবদলে প্রকৃতিকন্যা নিজেকেও বদলে ফেলে এভাবে:

> শীতল হাওয়ার স্রোত হঠাৎ খ্যাপাটে বুনো মোষের মতো যখন দাপাদাপি শুরু করলো তখন সরুদাসীর মুখ কালো হয়ে এলো, সে বললে, 'আই সেরেছে! উঠোনে ছাগলের শুকনো নাদি ডাঁই হয়ে রয়েছে, সব ভিজে কাদা হয়ে যাবে! কপালে আজ নির্ঘাৎ পিটুনি লেখা আছে।'[১৬]

সরুদাসী শুধু সুন্দর করে কথা বলে তা নয় তার দাঁতগুলোও ঝকঝকে। সরুদাসীর কথায় অনুর নিজের অভ্যন্তরে নদী বয়ে যায়। এই সরুদাসীর সাহচর্যে বৈশাখের বৃষ্টি দেখে অনুর মনে পড়ে, 'চল নামি, আষাঢ় আসিয়াছে—'[১৭]। সরুদাসীর প্রস্তাব মাগ-ভাতার খেলা—যার নিয়মও সে অনুকে শেখায়, যদিও অনুর রুচিশীল মন তাতে সায় দেয় না। তাতে কি-ই বা এসে যায়—সরুদাসীর কথার স্রোত অবিরাম বয়েই চলে। অনুর মনে পড়ে বাঞ্ছারামপুরের রানিফুফুর কথা সেও এমন অনর্গল কথা বলে। কিন্তু প্রাণহীন সেসব কথা কেননা তার

কাজই ছিলো অন্যের দোষ ধরা। সহজ, সরল, নির্ভার সরুদাসীর সাথে রানিফুফুর তুলনা চলে না।

> অবাক হয় অনু। সরুদাসী নিজেই আশ্চর্য রূপময় এক জগৎ। তার সবকিছুই কমবেশি আকর্ষণীয়। গল্প বলার ভঙ্গি, হাতপা নাড়া, ঠোঁট উল্টানো, চোখ বড় বড় করে তাকানো, সবকিছুর সঙ্গেই বুঝিবা মখমলের (মালীরা কখনো দূরে যায়?) সুন্দর কোমলতা জড়িয়ে আছে। স্বপ্নের ভেতরে নিজেকে দোল খাওয়াচ্ছে সরুদাসী, —নিঃসঙ্কোচ, অনর্গল, সহজ, তীব্র, আবার আচ্ছন্ন।[১৮]

এই সরুদাসী যখন অনুকে প্রস্তাব দেয়, 'চলনারে, তোতে আমাতে শুয়ে থাকি!'[১৯] তখন সরুদাসীর গায়ের আঁশটে গন্ধের অজুহাতে অনু রাজি না হলে তাদের খেলাঘর ভেঙে যায়। অনু একরাশ বিষণ্নতা নিয়ে ঘরে ফেরে। ঘরে এসে সেই পুরনো জীবনের পুনরাবৃত্তি দেখে। বন্ধুদের হীনম্মন্যতা, একে অপরকে পরাজিত করার ঘৃণ্য চেষ্টা, বাবা-মায়ের ঝগড়া—সবকিছু অনুকে ভীষণ ক্লান্ত করে। অনু আবারো দুপুরে বের হয়। সরুদাসী কেন তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো সেটা ভেবে কিছু বের করতে পারে নি সে। 'কেবল মনে হয়েছে সরুদাসীর অনেক কিছুই উহ্য, অনুক্ত, সামঞ্জস্যহীন।'[২০] শুধু তাই নয় 'এখন সরুদাসী এক নির্জন কষ্টের নাম। ...কোনোদিনই পৃথিবীতে সরুদাসীকে পাওয়া যায় না।'[২১] ঘরে ফিরে অনু বন্ধুদের দেখে। বাণীখালার সঙ্গে বাবা লামার মামার আত্মহত্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে। অনুর এসময় বাবাকে ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাবা-মার ঝগড়ার চরম মুহূর্তে অনু ক্রিস্টলের একটা ভারি শিশি দিয়ে বাবার কপালে আঘাত করে বসে। সে রাতে অনুর প্রচণ্ড জ্বর আসে। অনু সেরে উঠে সরুদাসীর খোঁজে ঋষিপাড়ায় আসে কিন্তু:

> ঋষিপাড়ায় পৌঁছে সবকিছু নতুন মনে হলো অনুর। কেমন এক মাটিতে নুয়েপড়া নিস্পৃহ চেহারা এই পাড়াটার; সরল, সহজ, বৈরাগ্য-ক্লান্ত অথচ পরম পরিতৃপ্ত আলোর ভেতর ধ্যানস্থ হয়ে আছে। অভিভূত হবার মতো নয়, কিন্তু এমন কোনো নরোম স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা আছে এখানে যা পরাক্রান্ত শহরের বুকে অন্য কোথাও নেই।[২২]

অনুর চোখে ঋষিপাড়া তার সকল অসৌন্দর্য নিয়েও সৌন্দর্যের আধার হয়ে ওঠে, অনুর চেতনায় সবকিছু সুন্দর হয়ে ওঠে। 'অনু এখানে খঞ্জনা পাখি' হয়ে যায়। কিন্তু যখনই সরুদাসীকে দেখে তখন সে শিউরে ওঠে। কেননা অনুর সরুদাসী এখন, 'উঠোনের একপাশে ইন্দারার খুব কাছাকাছি হাড্ডিচর্মসার এক বুড়ি ক্ষুদ কাঁড়িয়ে কাঁকর আলাদা করছে; শনের নুড়ির মতো চুল, একটাও দাঁত নেই,...।'[২৩] আজকের এই সরুচামারনীর স্বামী বুড়ো হরিয়া। অনু স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে আসে। বুড়ো হরিয়ার বাজানো পাখোয়াজের শব্দ তাকে তাড়া করে। তার 'মনে হলো, জারজ নিনাদে উন্নীত পাখোয়াজের উত্তরোত্তর দ্রুততর উত্তাল ফেনিল তরঙ্গমালা পিছন থেকে পরাক্রান্ত ঘাতকের মতো তেড়ে আসছে তার দিকে।'[২৪] এভাবেই *অনুর পাঠশালায়* বাস্তব আর রূপময় জগতের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। অনুর সরুদাসীর সাথে আজকের সরুচামারনীর দূরত্ব বাস্তবের সাথে স্বপ্নের দূরত্ব—যা কখনোই ঘোচে না। মাহমুদুল হক সরুদাসীর পরিণতিকে কাব্য হিসেবে দেখতে বলেন। তাঁর মতে, 'জীবনের কাব্য আছে। কাব্যের বাস্তবতা খুজতে [খুঁজতে] হয় না। তাই ক'দিনেই কিশোরী সরুদাসী ও [সরুদাসীও] শেষমেষ বৃদ্ধ সরুদাসী হয়ে উঠতে পারে এবং তার স্বামী কিশোর বন্ধু হরিয়া হলেও সেও বৃদ্ধ হরিয়া হয়ে উঠেছে।'[২৫] এর অন্য ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো যেতে পারে। নগরজীবনের প্রতিটি মানুষ একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন, অঢেল সম্পদ তাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না। ফকিরা, টোকানিদের কিছুই নেই

অথচ অনুর মনে হয় তারা অনেক সুখী। নগরজীবনের অন্তঃসারশূন্যতায় ব্যক্তির চিরন্তন একাকিত্ব আরও বেশি প্রকটিত হয়। মানুষ এখান থেকে বের হতে চায়। অনুও চেয়েছে। সরুদাসীর মতো 'রূপময় এক জগতে'র সন্ধানও সে পেয়েছিলো। কিন্তু সেটা স্বপ্ন শুধুই স্বপ্ন। ঘুম থেকে জেগে গেলে যার অস্তিত্ব থাকে না। যাদুবাস্তবতার কথা এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে। আবার জীবনানন্দ দাশ যেটাকে বিপন্ন বিস্ময় বলেছেন সেটাও বলা যেতে পারে। কিছু একটা যা:

অর্থ নয়, কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;[২৬]

জীবনানন্দ দাশ 'লাশ কাটা ঘরে' এই ক্লান্তির মুক্তি খুঁজেছিলেন আর অনু সরুদাসীর মধ্যে তেমন কিছু পেয়েছিলো এবং হারিয়েও ফেলেছিলো। প্রসঙ্গত বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) "অতিথি" গল্পের তারাপদর কথা। সে উন্মুক্ত পৃথিবীর উদাত্ত আহ্বানে অসীমের হাতছানিতে সব বন্ধন ছিন্ন করে ঘর ছেড়েছিলো হয়তোবা তেমনি এক বিশালত্বের আহ্বানে। কিন্তু সেই জায়গায় পৌঁছাতে হলে নিজের অস্তিত্বকে মুছে ফেলে নতুনভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয়। অনু সেটা পারে নি। সরুদাসীর আহ্বানে সাড়া দিতে তার আভিজাত্যে ভরা জীবনের সংস্কার বাধা দেয়। হয়তো এই দ্বিধায় অনুকে এই 'আশ্চর্য রূপময় জগৎ' থেকে বিচ্ছিন্ন করে মাটির পৃথিবীতে নামিয়ে আনে। কিশোর অনুর এই জটিল জীবনবোধ উপন্যাসটিকে বোদ্ধা পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য করে তোলে। মাহমুদুল হক চেয়েছিলেন একজন কিশোরের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখাতে।[২৭] আর এই কিশোরের চোখ দিয়ে আমরা দেখি নগরজীবনের আন্তঃসারশূন্যতা, ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, বস্তির রুগ্ন জীবন। এসবের পাশাপাশি এখানে অনুর মনোজগতে নিয়ত প্রবহমান যে খেলা চলে তারও রূপায়ণ ঘটান লেখক। আর এটা তুলে ধরতে এবং আখ্যানে রহস্যের সৃষ্টি করতে অনুর স্বপ্ন দেখার বিষয়টির অবতারণা। অনুর স্বপ্নগুলো খুবই বিক্ষিপ্ত, জটিল এবং ভয়ঙ্কর। সে স্বপ্নে বাবার নিষ্ঠুর রূপ, মায়ের রহস্যময় এবং উদ্ভট কার্যকলাপ এমনকি নিজের লাশও দেখে। তার পারিবারিক জীবনের জটিলতার সাথে সাথে তার মনের অবচেতন স্তরের জটিল ভাবনা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যেন। ফলে এই আখ্যানটি এক ধরনের বাস্তব আর অবাস্তবের মাঝামাঝি অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে শেষ হয়। এই অস্পষ্টতা বা ইঙ্গিতময়তা বা রহস্যময়তা যা বাংলা সাহিত্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বলে মাহমুদুল হকের আক্ষেপ[২৮] তারই সাড়ম্বর উপস্থিতি মাহমুদুল হকের প্রথম উপন্যাস *অনুর পাঠশালায়*।

*নিরাপদ তন্দ্রা* গ্রন্থাকারে মুদ্রিত দ্বিতীয় উপন্যাস। রচনাকাল জুন-ডিসেম্বর ১৯৬৮। নগর সমাজের বস্তির পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসটিও চরিত্রপ্রধান। এটি হিরন নামে একটি মেয়ের কঠিন জীবন সংগ্রামের গল্প। ইদ্রিস কম্পোজিটর ও জলিল বুকির কাছ থেকে গল্পটি সংগ্রহ করে পাঠককে শোনায় কথক কামরান রসুল। একটা তক্তপোশকে কেন্দ্র করে গল্প শুরু, যে তক্তপোশটি হিরনের। ইদ্রিস কামরান রসুলকে বলে, 'ফকিরচাঁদ সর্দারের বস্তি গড়ে ওঠার প্রায় পর থেকেই, তার মানে গত ছ'বছর ধরে এই চৌকিটার যাবতীয় বৃত্তান্ত আমার জানা। আমাকে চৌকিটার চিত্রগুপ্তও বলতে পারেন।'[২৯] ইদ্রিস হিরনের রূপের বর্ণনা দেয় এভাবে:

> তখন বছর সতেরো-আঠারো বয়স হিরনের। গায়ের রঙ তেমন ধবধবে ফরসা না হলেও একেবারে ফেলে দেয়ার মতোও নয়। সুন্দর দেহের গড়ন। নাক-মুখ-চোখ চেঁচেছিলে একেবারে নিখুঁতভাবে তৈরি। তাছাড়া যেমন শান্ত স্বভাবের, তেমনি নিরীহ। [৩০]

জয়পাড়া গ্রামের বয়াতি বাড়ির মেয়ে হিরন প্রেমিক কেরামতের জন্য ঘর ছেড়েছিলো একরাতে। সে জলেশ্বর মাঝির নৌকায় গ্রাম থেকে ঢাকা শহরে আসে। ফকিরচাঁদ সর্দারের বস্তিতে ইদ্রিস কম্পোজিটরের ঘরে ওঠে প্রেমিকের হাত ধরে। তারপর শ্যামল গ্রামের অবোধ মেয়ে হিরন ইট, কাঠ, কংক্রিটের ঢাকা শহরে বিশ্বাসঘাতক প্রেমিকের বঞ্চনার শিকার হয়ে এক পরিত্যক্ত জীবনের ভার বহন করে চলে। কামরান রসুল ভেবেছিলো প্রেমিক কেরামত ম্যানেজারের বিশ্বাসঘাতকতায় হিরন আত্মহত্যা করে। পাঠকও তেমন ভাবতে পারে। তবে লেখক মাহমুদুল হক ভালোবাসার জন্য যে নারী সাহসী হয়ে ঘর ছেড়েছে তাকে এত সহজে হার মানাতে প্রস্তুত নন। হিরন তার কাপুরুষ প্রেমিকের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু বস্তিতে এই নারীর সকল সৌন্দর্য হরণ করার জন্য মাংসলোভী পুরুষরা সোচ্চার হয়। হিরন প্ররোচিত হয়ে নষ্ট মানুষ কোবাত আলীকে বিয়ে করতে চাইলে ইদ্রিস বাধা দেয়। হিরন বিচিত্রভাবে হেসে বলে, 'আমার জীবন নষ্ট হতে কিছু বাকি আছে নাকি? যদি কিছুটা থেকেও থাকে সেটা আমি নিজের হাতেই পুরো করতে চাই।'[৩১] হিরনের এই উক্তির মধ্যে বিশ্বাসভঙ্গের যন্ত্রণা আর নিরাশ্রয়তার হাহাকার ফুটে ওঠে। প্রেমিকের পালিয়ে যাওয়া, আশ্রয়দাতার উদাসীনতা হিরনকে এমন আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে। বাড়ি ফিরে যাবার উপায় তার ছিলো না। একা বেঁচে থাকার সংগ্রাম গ্রামীণ জীবনে বেড়ে ওঠা সতেরো বছরের হিরনের জানা ছিলো না। কিংবা একটা অবলম্বন খোঁজার চেষ্টায় হিরন কোবাতকে বিয়ে করে। যেখান থেকে দুর্ভাগ্য এক হিংস্র জানোয়ারের মতো তাকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। শুরু হয় হাতবদলের পালা। কেরামত থেকে কোবাত, কোবাত থেকে আকদ্দস, আকদ্দস থেকে কাঞ্চন, কাঞ্চন থেকে হাবুল, কাঞ্চন থেকে কাশেম, কাশেম থেকে আবার কাঞ্চন এবং সবশেষে কাঞ্চন থেকে পতিতালয়ে—এভাবে 'চাঁদপানা মুখে'র হিরন হাতবদল হতে থাকে। এই পথহাঁটা তার শেষ হয় অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় ইদ্রিস কম্পোজিটরের ঝুপড়িতে ফিরে এসে। হিরন আলোর মুখ দেখতে চেয়েছিলো। কিন্তু তার জীবনে, প্রার্থিত আলোর নিদারুণ অভাব। হিরন দুবার ঘর বেঁধেছিলো। সন্তানের মাও হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত কোনোকিছুই টেকে নি। তাকে খোলা আকাশে নামতে হয়, হতে হয় বহুপুরুষের লালসার শিকার। যে কাঞ্চনকে সে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো দেখতো সেই তাকে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ঠেলে দেয়। হিরন বলে, 'থোড়াই পরোয়া করে সে আমাকে। ...ওর বিরুদ্ধে কিছু করার, ওর মুখের ওপর কিছু বলার ক্ষমতাই আমার নেই,—এখন যে আমাকেই ওর মেয়েমানুষ কেড়েছে—।'[৩২] পেটের দায়ে বয়াতির মেয়ে হিরন বস্তির আখড়ায় গান গাওয়া শুরু করে। হয়ে ওঠে হিরনবালা। কিন্তু সম্মান কোথাও মেলে নি। কোনো না কোনো পুরুষ লুটের মালের মতো হিরনকে ব্যবহার করে, পাশবিক নির্যাতন করে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয় এক আস্তাকুঁড় থেকে আরেক আস্তাকুঁড়ে। আখড়ার হিরনকে নিয়ে কাঞ্চনের সাথে 'কানা হাবুল' গুণ্ডার লড়াই বাধে। হাবুল কাঞ্চনের হাত কেটে ফেলে। তখন কাশেম গুণ্ডা এসে হিরনকে বলে, 'আজ থেকে কারো মাগী নস। তুই আখড়ার মাল, যতো ঝক্কি তোকে নিয়ে। যা শালী, আজ থেকে কারো হক নেই তোর ওপর। আমার কাছে থাকবি তুই।'[৩৩] এভাবে সে পুরুষের হাত বদল হতে থাকে। হিরনের কণ্ঠে এই অসহায়তা ঝরে পড়ে এভাবে:

> সবকিছুর জন্য তোমরা সবাই একা আমাকেই দুষবে। আমার যে দোষ নেই তা বলছি না, কিন্তু তোমরা সবাই যদি আমার মতো একজন মেয়েমানুষ হতে, যার পায়ের তলায় কোনো মাটি নেই, যার কখনো অবলম্বন বলে কিছু ছিল না, তাহলে হয়তো কতকটা আন্দাজ করতে পারতে আমার দশাটা।[৩৪]

হিরনের এই অসহায়তা পুরুষতন্ত্রের শিকার নিম্নবর্গের নারীর। নিম্নবর্গের নারীর কোনো বক্তব্য থাকে না, সমাজ তাকে অন্ধকারের গভীর তলদেশে নিক্ষেপ করে।[৩৫] হিরনের জীবনও এমনি এক সীমাহীন অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত হয়। হিরনের নিরাপদ তন্দ্রার জন্য একটু আশ্রয় এই বিশাল পৃথিবীতে কোথাও মেলে নি। ভেসে বেড়াতে হয়েছে সর্বক্ষণ। হিরন কাঞ্চনের পতিতালয়ে নরকসদৃশ জীবন থেকে মুক্তি চেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বলে:

> ইদ্রিস ভাই আমাকে উদ্ধার করো, জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে গেলাম আমি এই জাহান্নামে, ইদ্রিস ভাই আমাকে উদ্ধার করো, এতো অত্যাচার আমি সইতে পারবো না, আমি পাগল হয়ে যাবো এখানে, . . .আমার আর কিছুই নেই, ধুঁক ধুঁক করে কোনোমতে শুধু প্রাণটুকু টিকে আছে![৩৬]

হিরনের এই আর্তচিৎকার নিরাপদ তন্দ্রাচ্ছন্ন সমাজের শেকড় ধরে টান মারলেও জাগাতে পারে না। হাজারো অবহেলিত নারীর প্রতিনিধি হিরনের দুর্গম জীবনের কাহিনি *নিরাপদ তন্দ্রা* উপন্যাসটি। আমরা কোন সভ্যতার বড়াই করি—যেখানে নারী শুধু নারীই থেকে যায় মানুষ হয়ে উঠতে পারে না সেই সভ্যতার কি? আমাদের এরকম প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করান লেখক। নারীর জীবনের এই চরম অপমান সাহিত্যে অনেকবার অনেকভাবে উঠে এসেছে। মাহমুদুল হকের *নিরাপদ তন্দ্রা*-র হিরনের গল্পের বিশেষত্ব তবে কোথায়? সেটাই এবার আলোচনার বিষয়। হিরন কিন্তু আর দশটা অপমানিত নারীর মতো হারিয়ে যায় নি। সে ইদ্রিস কম্পোজিটরের ঝুপড়িতে ফিরে এসেছে। হ্যাঁ, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়। কিন্তু তাতে কি? ফিরে আসার পর উপন্যাসের শেষ ছয় পৃষ্ঠা ধরে হিরন কামরান রসুলকে তার প্রেমিক কেরামত ভেবে ক্রমাগত কথা বলে যায়। পুরো কথাগুলোয় কোথাও কোনো পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার নেই আছে কমা, ড্যাস, হাইফেন আর শেষে একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন। এই যে হিরন অনর্গল কথা বলে আচ্ছন্ন অবস্থায়, কোথাও কিন্তু কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, নারীর অধিকার নিয়ে বাগাড়ম্বর নেই। বহুপুরুষ-ব্যবহৃত হিরন ঠিক চেতনার সেই জায়গায় এখন অবস্থান করে যেখানে ধুলোমাটির এই পৃথিবীর পাপ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না। হিরন শুরু করে জলেশ্বর মাঝি জয়পাড়ায় তাকে আনার জন্য যায় তখন থেকে। অর্থাৎ জয়পাড়ার বয়াতি বাড়ির ঘর ছাড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তটা থেকে। হিরন বলে চলে জলেশ্বর মাঝির সারারাত নৌকা বাওয়ার কথা, ছোট ভাই-বোনের কথা, বাবার কথা, মায়ের কথা যে মা তাকে একদিন 'বাপ-ভাতারী' বলে গাল দিয়েছিলো। হিরন বলে:

> বলো তো এতো কান্না পাচ্ছে কেন আমার, এই তো তুমি আমার হাত ধরে আছ, এতো কাছে তুমি, তবু কান্না পাচ্ছে আমার, ইচ্ছে করছে তোমার কোলে মুখ রেখে সারারাত ধরে কাঁদি, জলেশ্বরের নৌকোয় যেমন কেঁদেছিলাম, তোমার কোল তো জলেশ্বরের নৌকো, মাত্র দুটো দিন বই তো নয়, মনে হচ্ছে যেন এক যুগ, জয়পাড়ার আমি আর কেউ নই, দু'দিন [দু'দিনে] এতো বদলে যায় মানুষ, চুপ করে আছো কেন, কথা বলো, আমার জীবন আমার নয়নের মণি, কথা বলো, আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবার মতো কি একটি কথাও তোমার জানা নেই কেরামত ভাই![৩৭]

হিরনের গল্প শেষ। তার মন থেকে মুছে যায় গত ছয় বছরের যন্ত্রণাদীর্ণ পথ হাঁটার গ্লানিময় স্মৃতি। সে এখন ভালোবাসার স্নিগ্ধ অনুভবে আচ্ছন্ন এক প্রেমিকা নারী। হিরনের স্রষ্টা মাহমুদুল হক বলেন:

> *নিরাপদ তন্দ্রা*র হিরন শেষ পর্যন্ত তর [তার] প্রেমিক-পুরুষের কাছেই ফিরে এসেছিল, তবে মানুষটি যে কেরামত নয় তখন তার এ বোধ লোপ পেয়েছিল। . . . এ তার স্বপ্নের ঘর, এখানেই সে রচনা করতে চেয়েছিল বেহেশত। বেহেশত হয়নি, হয়েছিল দোজখ। হিরনকে আমি প্রেমের প্রতিমূর্তি হিসেবে গড়তে চেয়েছিলাম। তখনও পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল একমাত্র নারীই জানে প্রেম কী। ... হিরন সব বিস্মৃত হয়ে ফিরে এসেছিল বলেই সে মহান, তখন সে আর সাধারণ মানবী নয়, তখন সে নিজেই রূপান্তরিত প্রেমে, আর প্রেম, প্রেমের কখনো মৃত্যু হয় না। নানাভাবে তা রূপান্তরিত হয়। মাংস ব্যবসায়ী বা অপ্রেমিকেরা এই রূপান্তরকে সাধারণ পাগলামি হিসেবেই দেখে থাকে। আমি যে প্রেমকে হামানদিস্তায় ফেলে ঠুকে ঠুকে মাথার মুকুট করেছি, তার নাম হিরন।[৩৮]

লেখকের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে আমরাও একমত। আমরা মাংস ব্যবসায়ী বা অপ্রেমিক নই তাই হিরনের যে রূপান্তর ঘটেছে তাকে আমরা অনুভব করি। রূপান্তর হচ্ছে বাহ্যিক বা বহিরাঙ্গিক পরিবর্তন যেখানে চেতনা ঠিক থাকবে। যেমন কাফকার "মেটামরফোসিস"-এ গ্রেগর স্যামসার রূপান্তর ঘটেছিলো চেতনা ঠিকই ছিলো। একইভাবে বাইরের পৃথিবী তার সমস্ত পঙ্কিলতা নিয়ে হিরনের শরীরটার বিকৃতি ঘটালেও চেতনায় কোনো আচঁড় কাটতে পারে নি। হিরন প্রেমিকা ছিলো এবং শেষেও সে প্রেমিকাই। লেখক তো সমাজের গলদের ওপর প্রতিবেদন তৈরি করবেন না। সে কাজ সাংবাদিকের, শিল্পীর নয়। শিল্পী গল্পের ভেতরে আরেক গল্পের খোঁজ করেন, বাস্তবের ভেতরে অন্য এক বাস্তবের সন্ধান দেন পাঠককে, সেই রহস্যময়তাই তো শিল্প। সেই জগতেই মাহমুদুল হক তাঁর পাঠককে নিয়ে যান যে জগতে বিচরণ করতে গিয়ে পাঠক আর চরিত্র একাকার হয়ে যায়। হিরনের এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা পাঠকের কাছে আর তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না, পাঠক শুধু দেখে এক প্রেমিকা নারী, যে জয়পাড়ার বয়াতি বাড়ির মেয়ে, একজনের ভালোবাসায় সাহসী হয়ে, জলেশ্বর মাঝির নৌকায় করে, স্বর্গ রচনায় বেরিয়েছে এই মাটির পৃথিবীতে। এই উপন্যাসে নগরসমাজের বস্তিজীবনের অন্ধকার দিকের বাস্তবোচিত রূপ ফুটে ওঠে তার সমস্ত নির্মমতা নিয়ে। এক নিরাসক্ত, নির্মোহ ভঙ্গিতে লেখক সেই জীবনকে এঁকেছেন যেখানে আছে লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ আর ভালোবাসাহীন, মমত্বহীন এক জাহান্নাম। পেটের ক্ষুধা আর হিংস্রতার মিশেলে ভরা এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে নিরাপদ তন্দ্রার খোঁজে নিঃসঙ্গ পথ হাঁটে জয়পাড়া গ্রামের বয়াতি বাড়ির মেয়ে হিরন।

তৃতীয় উপন্যাস *জীবন আমার বোন*-এর রচনাকাল ১৯৭২ সাল। এই উপন্যাসের পটভূমি গড়ে ওঠে ১৯৭১-এর মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বমুহূর্তের আগুনঝরা দিনগুলোতে ঢাকা শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানুষের কিছু টুকরো ছবি এখানে আঁকা হয়। আগের দুটো উপন্যাসের মতো এটাকেও চরিত্রপ্রধান বলা যায়। তবে ঘটনা ও কেন্দ্রীয় চরিত্রের বিকাশ একই সমান্তরালে ঘটেছে। ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের পরের দুটি দিনের রক্তমাখা গল্প দিয়ে কাহিনি শেষ। ধানমণ্ডির এক অভিজাত সচ্ছল পরিবারের সন্তান ২২ বছরের জাহেদুল কবির ওরফে খোকা। তাকে জড়িয়ে আছে বয়সে তার চেয়ে সাত বছরে ছোট বোন রঞ্জু, বন্ধুবান্ধব, নীলাভাবী, রাজীব ভাই এরা। সবাই সাধারণ মানুষ। খোকা দেশি-বিদেশি সাহিত্য 'গিলে খেয়েছে'। একটু উন্নাসিক, ব্যক্তিজীবনে নয়,

রাজনীতির ব্যাপারে। রাজনীতি নিয়ে খোকার মন্তব্য, 'রাজনীতির ব্যাপারটাই আগাপাস্তলা একটা জমকালো ছেনালি;...।'[৩৯] রাজনীতির উত্তাপে দ্রুত বদলে যাওয়া ঢাকা শহরের সঙ্গে খোকা নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে না। তার ধারণা, 'কেমন একটু ভিন্নধাতে গড়া আমি— ...।'[৪০] খোকার বুদ্ধিদীপ্ত মনের কাছে 'ধর্ম আর রাজনীতি ব্যবসার রাঘব-বোয়ালরা ভেজাল ওষুধের কারবারি কিংবা পচা মাছ বিক্রেতার চেয়েও জাতে নিকৃষ্ট— ...।'[৪১] সবকিছুকে এভাবে দেখতে অভ্যস্ত খোকা রেক্সের আড্ডা, জাতীয় পরিষদ অধিবেশন, ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র, আইনগত কাঠামো—এসবের চেয়ে বেশি আকর্ষণ অনুভব করে তার চেয়ে নয় বছরের বড় নীলাভাবীর প্রতি। খোকার মন্তব্য:

> বরং নীলাভাবী অনেক ভালো। কথার প্যাঁচে ফেলে একে অপরকে অহেতুক হেনস্তা করার কোনো অপপ্রয়াস নেই ওখানে। আড্ডা আর তর্কের মুখোশ এঁটে বন্ধুরা যখন মাঝে মাঝে হীন মনোবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে একে অপরের নামে কাদা ছোড়াছুড়ি করে, জারিজুরি ফাঁসের ব্যাপারে পরস্পর নোংরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়, তখন তার মন বিশ্রীরকম তেতো হয়ে যায়। নীলাভাবীর ওখানে আর যাই হোক এইসব কদর্য ব্যাপারের মুখোমুখি হতে হয় না তাকে; কখনো কুঁজো বামন অস্কারের মতো টিন ড্রাম বাজায় না কেউ, বরং 'ঘুমের ভিতর বালকের পেচ্ছাবের মতো' অলক্ষ্যে সময় কেটে যায়।[৪২]

যদিও নীলাভাবীর সাথে খোকার একটা লিবিডোতাড়িত সম্পর্ক রয়েছে তারপরেও খোকার এই স্বীকারোক্তি প্রমাণ করে মানুষের ভণ্ডামি থেকে সে দূরে থাকতে চায়। সদ্যস্নাতা নীলাভাবীকে দেখে খোকার মনে হয়, 'দেশটাকে খোলামকুচির মতো হাতে পেলে পুরো ঢাকা শহরটাকেই একটা হামামখানা বানিয়ে দেওয়া যায়, . . . .'[৪৩] মিছিলে যখন ঢাকা শহর আক্রোশে ফেটে পড়ে খোকা তখন নীলাভাবীর কোমল সান্নিধ্যে 'রাজকুমার ব্যাঙ' হয়ে ওঠে। দেশের প্রতি খোকার এই উন্নাসিকতাই কিন্তু তার সম্পর্কে শেষ কথা নয়। অনুজ্জ্বল খোকার উজ্জ্বল উপস্থিতি গোটা উপন্যাস জুড়ে থাকলেও ম্লান করে দিতে পারে না অন্যদের। যেমন : বন্ধু মুরাদ, আলতাফ, গঞ্জালেস, ইয়াসিন। এই উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র সময়। খোকার চোখে সময় তার রূপ নিয়ে উঠে আসে এভাবে : 'ঢল নেমেছে রাস্তায়। মানুষের এমন রুদ্রমূর্তি সে আর কখনো দেখেনি। পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, দিগ্বিদিক ঝাপসা, অবলুপ্ত; চতুর্দিকে বোমার মতো ফেটে পড়ছে স্লোগান।'[৪৪] পথের এই দৃশ্য খোকাকে বাড়িতে একা থাকা বোন রঞ্জুর জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। বোন রঞ্জুকে নিয়ে খোকার অন্য এক জগৎ। ভীষণ মায়া সে জগতে। কিন্তু খোকার শুধুই কি বোনের প্রতি এই মায়া? দেশের জন্য কিছুই নেই? মনে হয় না। রাজনীতি নিয়ে তার করা মন্তব্যগুলো আপাত নেতিবাচক মনে হলেও একটু তলিয়ে দেখলে একটা কষ্টের ছবি সহজেই অনুভব করা যায়। একটা দল যারা সুযোগ-সন্ধানী ক্ষমতার পালাবদলে লাভবান হয় সবসময়। '৪৭-এ যেটা হয়েছিলো। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সাধারণ মানুষের মুক্তি আনতে পারে নি। তাই মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে আরেকটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের জন্য এই জনপদের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। খোকা তার বন্ধুদের বলে, 'পরিবর্তনের আর রূপান্তরের তফাৎ বুঝিস?'[৪৫] খোকার এই বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করলে তার আপাত নেতিবাচকতার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যেতে পারে। রূপান্তর বাহ্যিকভাবে ঘটে থাকে চেতনাগত কোনো রদবদল হয় না। তাই দেশের যদি রূপান্তর ঘটে তাহলে তো এসব স্বার্থান্বেষী মানুষই রয়ে যাবে। যাদের কাছে মনে হয় দেশের এই সংকটকালীন সময়ে করণীয় হচ্ছে, 'এই তো সময় চুটিয়ে আড্ডা মারার। গরম বাজার, অফুরন্ত সময়, স্রেফ চা মারো আর গুলতানি।'[৪৬] যারা

মিছিলের সুযোগে কবিতার বই বিক্রির চেষ্টা করে, ব্যবসার খাতিরে বা চাকরির উন্নতির জন্য শাড়ির আঁচল বারবার খসে পড়ে যাদের, এমন জনতাই যদি রয়ে যায় সে বিপ্লবে সুখকর কী ঘটবে। খোকা আসলে সবকিছুর সাথে তাল মেলাতে পারে না। এর কারণ হতে পারে—সে সবকিছু গভীরভাবে চিন্তা করে। আসাদের মৃত্যু তাকে ব্যথিত করে। তার ধারণা, একুশে ফেব্রুয়ারিকে মানুষ ভাঙিয়ে খাচ্ছে, একটাও বিদগ্ধ মানুষ নেই এদেশে, 'সবাই ভূসিমাল'। খোকা এমন ভাবলেও বন্ধু মুরাদ কিন্তু অন্যরকম ভাবে, 'এর আগে কখনো আমরা এমনভাবে একাত্মতা অনুভব করি নি। সারা দেশের মানুষ আশ্চর্যভাবে এক হয়ে গিয়েছে।'[৪৭] তাহলে খোকার ভাবনাটা শেষ কথা নয়। সময়ের দাবিকে লেখক অগ্রাহ্য করেন নি। হ্যাঁ, লেখক একটা কোনো দিকে নিজের অবস্থান নিয়ে দাঁড়ান নি, দেখাতে চেয়েছেন গণমানুষের একটা অংশ বাংলাদেশ তৈরির সময় কীভাবে ভাবছিলো। এটা তো ঠিক, এসময় একটা শ্রেণি সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলছে, আরেকটা শ্রেণি আবার ওদের বিপথগামী বলছে, এমনইতো ছিলো পরিস্থিতি। খোকার ভাবনা লেখকের ভাষায় : 'দেশের বর্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতির সত্যিকার চেহারা কোনো বক্তৃতাতেই নেই, এদের ঘৃণা করে খোকা, এরা লোভী, ধূর্ত, শঠ, প্রবঞ্চক, সমগ্র রুচিকে এরা বিকৃত করে তুলেছে।'[৪৮] তাহলে দোষের কী? আমরা কিন্তু আহমদ ছফার *অলাতচক্র* উপন্যাসে খোকার বক্তব্যের একটা বাস্তব রূপ দেখতে পাই। সবকিছুকে সবার মতো করে দেখছে না বলে খোকার ব্যাপারে পাঠকের একটা সন্দেহ তৈরি হয়। মাহমুদুল হক এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালের অসহযোগ আন্দোলনের পঁচিশ দিনের কিছু খণ্ডচিত্র ওতে আছে, যা সম্পূর্ণ ঢাকা শহরকেন্দ্রিক; আমি মুক্তিযুদ্ধের কোনো ইতিহাস রচনা করিনি...।'[৪৯] এটা ঠিক *জীবন আমার বোন* মুক্তিযুদ্ধের কোনো ইতিহাস নয়। তবে ইতিহাস তৈরির সময়টাকে ধরার একটা চেষ্টা বা সচেতন প্রয়াস লেখকের আছে। এই উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে লেখক বলেন:

> খোকা এমন কিছুই করে নি যে ইতিহাসের পাতায় তার নাম থাকবে। মুমূর্ষু বাঙালি জাতি ইতিহাস তৈরির নেশায় মেতে উঠেছিলো; এক পলায়ন ছাড়া সেখানে খোকার কোনো ভূমিকা নেই, ইতিহাসের ধূসর আড়ালে খোকারই তো প্রথম মুখ লুকোবার কথা।[৫০]

হয়তো তাই, হয়তো নয়। কেননা খোকারও তো আত্মত্যাগ কম নয়। ছোটবোন রঞ্জু, যে তার শুধু বোন নয় জীবন ছিলো, তাকে হারাতে হয়। 'একলক্ষ চল্লিশ হাজার পায়ের তলায় পড়ে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিলো কি নিরঞ্জন রঞ্জু?'[৫১] খোকার শেষ উপলব্ধি 'দেশ তাহলে একটা পুকুর। অঞ্জু মঞ্জুর মতো এর নিস্তরঙ্গ নিথর তলদেশে চিরকালের জন্যে হারিয়ে গিয়েছে রঞ্জু।'[৫২] খোকার ছোট দুই বোন অঞ্জু ও মঞ্জু, যারা মামাবাড়ির পুকুরের শ্যাওলা ধরা শানে পা পিছলে পানিতে ডুবে মারা যায়। খোকা রাজনৈতিক নেতাদের মনভোলানো বক্তৃতা শুনতে শুনতে হারিয়ে যায় মনের অবচেতনে। দেশ হয়ে যায় তখন তার কাছে অর্ধেন্দু দস্তিদার, প্রীতিলতা কিংবা অঞ্জু মঞ্জুর কবর। অবচেতনে খোকা নস্টালজিক হয়ে পড়ে। আত্মভাবনায় বিভোর খোকার কাছে মনে হয়:

> সবকিছুই একটা স্বপ্ন। স্বপ্নের ভিতরে আমরা জন্মাই, স্বপ্নের ভিতরে আমরা চিৎকার করে উঠি, . . .স্বপ্নের ভিতরে আমরা স্তন্যপান করি, স্বপ্নের ভিতরে আমরা শিল কুড়াই, স্বপ্নের ভিতরে আমরা বকুল ফুলের মালা গাঁথি, স্বপ্নের ভিতরে অঞ্জু পুকুরে পড়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে মঞ্জু তাকে ধরতে যায়, স্বপ্নের ভিতরে নীলাভাবী কাচের চুড়ির শোকেস হয়ে যায়, . . .স্বপ্নের ভিতরে মোদিল্লিয়ানী রঙ ছুড়ে দেয়, স্বপ্নের ভিতরে অর্ধেন্দু মুখ

> পুড়িয়ে ফেলে, স্বপ্নের ভিতরে মতিয়ুর শালিক হয়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে প্রীতি বিষ গলায় ঢালে, স্বপ্নের ভিতর হাইপোস্টাইল হল ভেঙে পড়ে, স্বপ্নের ভিতর পার্থেনন গমগম করে বাজে, স্বপ্নের ভিতরে পাপ পুণ্য হয়ে যায়, স্বপ্নের ভিতরে আত্তিলা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে, স্বপ্নের ভিতরে অন্ধকার হড়াম করে ওঠে, স্বপ্নের ভিতরে দেখতে দেখতে আমরা আরেক স্বপ্ন হয়ে যাই।[৫৩]

এভাবেই স্বপ্নের ঘোরে বাস্তব থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র খোকা। তাই তো সমালোচকের মন্তব্য:

> ...সবকিছু হারিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির সময়ের এক বিরুদ্ধ ট্রাজিক নাম হয়ে উঠেছে খোকা। খোকা যদি রাজাকার হয়ে উঠতো তাহলে হয়তো এ ট্রাজেডি হতো না। রাজাকার সে হতে পারে নি। যে ইউরোপীয় শিক্ষা সে গ্রহণ করেছে তা তাকে রাজাকার বানায় নি। আবার পাকিস্তান রাষ্ট্রের সুবিধা গ্রহণ তাকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে। সে কারো জন্যই নিজে [নিজেকে] প্রস্তুত করতে পারে নি, না দেশের জন্যে না রঞ্জুর জন্যে। সে শুধু নিজের জন্য নিজেই একটা দৈত্য হয়ে উঠেছিলো। সে দৈত্যের নাম নার্সিসাস। সে দৈত্য তাকে গিলে খেয়েছে শেষ পর্যন্ত।[৫৪]

এই মন্তব্যটি মেনে নিলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু রয়ে যায়। আত্মপ্রেমই কি খোকাকে এমন বিচ্ছিন্ন করে? তার সবকিছুকে সহজভাবে নিতে না পারা এবং সবার সাথে তাল মিলিয়ে না চলতে পারার কারণ সম্পর্কে মাহমুদুল হকের ব্যাখ্যা এমন:

> সবকালেই সবদেশে ওরকম কিছু মানুষ থাকে যারা প্রবল কোলাহলেও একা, যারা জনতার সঙ্গে মিলে যেতে পারে না। ...খোকা তাদের প্রতিনিধি। আমি এরকম একজন মানুষের চোখে যুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চেয়েছি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি অন্য সবকিছু অস্বীকার করেছি।[৫৫]

আর তাই খোকা বাস্তব থেকে বিযুক্ত হলেও মাহমুদুল হক বাস্তব থেকে বিযুক্ত হন না। ২৫ মার্চের ভয়াল রাতের বর্ণনার পাশাপাশি উপন্যাসের শেষ অংশে লেখক 'দেশের বিরাট একটি অংশের লাল মরণোল্লাসে' ঝাঁপিয়ে পড়ার ইতিবৃত্ত বলতে ভোলেন না। 'মুরাদ, রহমান, এমন কি ইয়াসিনও মুক্তিযোদ্ধা হয়ে লড়াই করেছে! রহমান নিহত। ইয়াসিন পঙ্গু। গেরিলা কমান্ডার মুরাদের বীরত্বের খ্যাতি গোপনে গোপনে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।'[৫৬] যে মুরাদ খোকার দৃষ্টিতে স্বার্থলোভী মধ্যবিত্তের প্রতীক ছিলো সেও গেরিলা কমান্ডার হিসেবে বীরত্বব্যঞ্জক খ্যাতি পেয়েছে। যুদ্ধ কাউকে সাহসী করে তোলে, কাউকে উদার করে তোলে, আর কাউকে বা আত্মকেন্দ্রিক ভীরু মানুষে পরিণত করে। তাই বলা যায় বহুমাত্রিকতায় সমৃদ্ধ *জীবন আমার বোন* উপন্যাস—'একদিকে যেমন কিছু মানুষের ব্যক্তিগত, ক্ষেত্রত উন্নাসিক জীবনচর্যা ও ভাবনা-কল্পনাজারিত, অন্যদিকে তেমনি তা বহু তথা সমষ্টিগত মানুষের অনিকেত জীবনসংগ্রামের এক প্রায় কাহিনীহীন কাহিনী, অনপনেয় সময়ের দলিল।'[৫৭]

চতুর্থ উপন্যাস *কালো বরফ*-*এর* রচনাকাল ২১-৩০ আগস্ট ১৯৭৭। এই উপন্যাসটিতে মাহমুদুল হক '৪৭-এর দেশবিভাগের পর ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় আসা পোকা ওরফে আবদুল খালেকের কথা বলেছেন। এর আগের উপন্যাসগুলোতে মাহমুদুল হক চরিত্রকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। *কালো বরফ*-এ চরিত্র ও গল্প প্রায় সমান প্রাধান্য পায়।

বর্তমানে মফস্বলের এক বেসরকারি কলেজের শিক্ষক আবদুল খালেক। উপন্যাসের বিজোড় অধ্যায়ে আবদুল খালেকের শৈশব এবং জোড় অধ্যায়ে বর্তমান জীবনের প্রসঙ্গ রয়েছে। আর শেষ অধ্যায় যার নামকরণ করা হয় 'আলো ছায়ায় যুগলবন্দি' সেখানে পোকা আর আবদুল খালেকের একত্র প্রকাশ ঘটে। আবদুল খালেক ডায়েরি লেখে। অতীত নিয়ে, সেই অতীত যেটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছিলো। সেই ডায়েরিতে শুধু আবদুল খালেক নয় তার পরিবার, আশেপাশের আত্মীয় অনাত্মীয়রা, এমন কি দুটি বিড়াল, একটি ঠ্যাং ভাঙা শালিকসহ সবারই কথা থাকে। এই অতীত নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির ভেতরে আনন্দ আর কষ্ট একাকার হয়ে মিশে যায়। সেই কষ্টের ভেতর থেকে ফুঁড়ে ওঠে আর্ত চিৎকার:

> যা কিছু নিঃশব্দ, যা কিছু শব্দময়, যা কিছু দৃশ্যগোচর, দৃশ্যাতীত, সবকিছুই একজোট হয়ে হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরে; অদ্ভুত এক বাজনার তালে তালে আস্ত একটি রাত মোমের মতো গলে পড়ে, জিনজার-হিনজার জিনজার-গিনজার, জিনজার-হিনজার পোকা শোনে, শুনতে পায়। পোকা পোকা হয়ে যায়।[৫৮]

দেশবিভাগ মানুষকে মনুষ্যত্ববোধহীন পোকাতেই রূপান্তরিত করেছিলো। রাজনীতির উন্মাসিক উন্মাদনায় ব্যক্তিমানুষের শেকড় হারানোর যন্ত্রণা পোকার প্রতিটি কথায় ফুটে ওঠে। 'তার একবার ছিঁড়ে গেলে আর জোড়া লাগে না' কিংবা 'জীবনের পুরোটাই কম্প্রোমাইজ' এই দর্শনে বিশ্বাসী আবদুল খালেকের বর্তমান বারবার মিশে যায় অতীতে। অনিশ্চিত বর্তমানের জীবন আবদুল খালেককে যতটা না ভাবায় তার চেয়ে বিমুগ্ধ শৈশব বেশি টানে। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা দুভাবে হতে পারে। এই অতীতচারিতা হতে পারে বর্তমান জীবনযন্ত্রণা থেকে বাঁচার পথ খোঁজার জন্য। কিংবা দেশবিভাগের দগ্‌দগে ঘা-টা সত্তার একেবারে গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে—যে রক্তক্ষরণ কখনোই ফুরোবে না সেজন্য। জীবন-পলাতক বলা যায় না আবদুল খালেককে। কেননা ডুবে গিয়েও ভেসে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টায় কিছুটা উৎরে ওঠে সে উপন্যাসের শেষ অধ্যায়ে। কিন্তু সেখানেও শৈশব হানা দেয় তার সমস্ত ভালোলাগা নিয়ে। ছেলেবেলায় পোকাদের জানা ছিলো না দেশবিভাগ কী, এমনকি পাকিস্তান কী সেটাও জানা ছিলো না। জানার কথাও নয়। কিন্তু সত্যিসত্যি 'হুট করে একদিন পাকিস্তান হয়ে গেল' যখন তখন আর পোকাদেরও না বোঝার কিছু থাকে না। আগের চেনা শব্দ মুসলমান, হিন্দু এখন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে পোকাদের ছেলেবেলাকে খান খান করে দেয়। তাই জন্মস্থান, প্রিয় ও চেনাশোনা পরিবেশ, খেলার সাথী সবাইকে ছেড়ে সম্পূর্ণ অচেনা এক দেশে পা বাড়াতে হয় পোকাদের। রাজনীতি দু-দেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া টেনে দিলেও হৃদয়ের মধ্যে কোনো দেয়াল তৈরি করতে পারে নি। তাই বেসরকারি কলেজের শিক্ষক আবদুল খালেক স্ত্রী আর শিশু সন্তান টুকুকে নিয়ে এক অনিশ্চিত বর্তমানে দাঁড়িয়েও বারবার নিজের মানস আয়নায় চলে যায় অনেক বছর পেরিয়ে সেই ফেলে আসা শৈশবে। আবদুল খালেক ও রেখার জীবনে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, দাম্পত্য সম্পর্কে সংকট, ভুল বোঝাবাঝি সবকিছু থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টায় আলোছায়ায় যুগলবন্দি হয়ে নৌকা ভ্রমণে বের হওয়া এবং অতীত আর বর্তমানের মিশেলে একটা ভালোলাগা পরিবেশ তৈরি করে গল্পের শেষ করা হয়। পোকার শৈশব থেকে উঠে আসে পাঁচু, ঝুমি, আলতাপায়ে মেয়ে পুঁটি যে পাখি, মাছ এমনকি গাছের সঙ্গেও কথা বলতে পারতো। এছাড়া ডালপুরিবুড়ো, পানু যে সাহেবদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলে পাড়ায় হিরো হয়ে গিয়েছিলো রাতারাতি, আরো আছে পোকার স্কুলের সঙ্গীরা, দিদিমণিরা, রানিবুবু, টিপু ভাইজান আর গল্পের তথা পোকার শৈশবের অনেকটা জুড়ে থাকা প্রিয় মনি ভাইজান

এবং মা। অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর মনি ভাইজান ছিলো পোকার সবচেয়ে কাছের মানুষ। গিরিবালা নামের এক অচল বৃদ্ধা থেকে শুরু করে রানিবুবুর বান্ধবী ছবিদি সবাই ভরিয়ে রেখেছিলো পোকার শৈশব। রানিবুবুর বিড়াল কুন্তি এবং তার মৃত্যুতে নতুন বিড়াল টোটা, একটা ঠ্যাং ভাঙা শালিক যাকে পোকা মনে করতো তার মৃত বোন তুলি, সেও বাঙ্ময় হয়ে উঠে আসে গল্পে। "ক্যাঁ ক্যাঁ করে শালিকটা ডাকার পর পুঁটি বললে, '...পাকিস্তান চায় বলে হিন্দু পাখিরা নকি ওর ঠ্যাং ভেঙে দিয়েছে,...।'"[৫৯] —এভাবে একটি শালিকও পোকার শৈশবে দেশবিভাগের চক্রান্তে নিজের অঙ্গ হারিয়ে পঙ্গু হয়। অসাধারণ প্রতীকী উপস্থাপনা। মনি ভাইজান দেশ ছাড়তে চায় নি। কিন্তু যখন তাদের বাধ্য করা হলো কিংবা পরিস্থিতি এমন হলো যে দেশ থেকে চলে আসাটা জরুরি ঠিক তখন মনি ভাইজান ছবিদির কাছে ছুটে গিয়েছিলো পোকাকে নিয়ে। ছবিদির কাছ থেকে ভালোবাসার চিহ্ন মাথার কাঁটা, ক্লিপ নিয়ে এসেছিলো। মনি ভাইজান কথা দিয়েছিলো ছবিদির কাছে ফিরে যাবে কিন্তু পারে নি। মায়ের সামান্য কথায় ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যা করে। আবদুল খালেক ভাবে:

> এইভাবে সবকিছু একদিন গল্প হয়ে যায়। জীবনে সেই প্রথম, এক গভীর রাতে, তার কানে বেজে উঠেছিল—লৌহজং, লৌহজং। পাশে দাঁড়ায়ে মনি ভাইজান, মনি ভাইজানের জামার পকেটে একটা ফিতে, ফিতেয় চুলের গন্ধ, যে গন্ধে অনেক দুঃখ, যে দুঃখে অনেক ভালোবাসা, যে ভালোবাসায় অনেক ছেলেবেলা...।[৬০]

মাহমুদুল হক এভাবে *কালো বরফ*-এর শরীর জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন গল্পের আখ্যান বুনে চলেন। পোকার বাবা সকলের অমতে পাকিস্তানে চলে আসে। তাঁর মতে, 'মাথা উঁচু করে চলতে পারাটাই বড় কথা। যেখানে মাথা উঁচু করে থাকতে পারবো, সেটাই দেশ।'[৬১] কিন্তু মা আসতে চায় নি অজানা এই দেশে। আমরা ব্যক্তি মাহমুদুল হকের জীবনের গল্পটাও জানি। প্রায় একইরকম। হয়তো এজন্যই দক্ষ ডুবুরির মতো সত্তার গভীরে ঢুকে তুলে আনতে পেরেছেন মাহমুদুল হক সেই মর্মস্পর্শী অনুভব যেখানে গল্পের এক পোকার শৈশবের সঙ্গে পাঠকের মনে দেশবিভাগে বিচ্ছিন্ন হাজারো পোকার শৈশব উঁকি দেয়। একটি কণ্ঠ বহু কণ্ঠ হয়ে যায়। একজনের ছেলেবেলা সকলের ছেলেবেলা হয়ে যায়। তাঁর কলম সেইসব না বলা কথার মালা গাঁথে যা হৃদয়ের গহিনে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। আবদুল খালেকের বন্ধু সুহৃদ নরহরি ডাক্তার। সে দেশ ছাড়ে নি। কিন্তু দেশ কি তাকে ধরে রাখে? মাঝে-মধ্যেই তাকে শুনতে হয়, 'যাও না শালা, পড়ে আছো কেন, তোমার বাপের দেশে যাও। তবু মাটি কামড়ে পড়ে আছি। নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিই, অনেকের চেয়ে ভালো আছি। বেঁচে থাকতে হলে কিছুটা কম্প্রোমাইজ তো করতেই হয়—।'[৬২] মাহমুদুল হক শুধু দেশবিভাগের যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী ছবি আঁকেন নি সমকালও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে উপস্থাপিত হয় এই উপন্যাসে। সংসারের আর্থিক টানাপোড়েনে আবদুল খালেকের স্ত্রীর অসন্তোষ। একটু সচ্ছল জীবনের আশা করাটার মধ্যে রেখা দোষের কিছু দেখে না। কিন্তু আবদুল খালেক অপারগ। নরহরি ডাক্তারের কাছে গ্রামের দুঃস্থ, অশিক্ষিত, অসহায়, সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য আসে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক জীবনের একটা চালচিত্রও ফুটে ওঠে সেসবের মধ্য দিয়ে। আর্থিক অনটন আবদুল খালেককে তার স্বজনদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বড় ভাই ভালো আছে কিন্তু বাকিরা, আবদুল খালেক কিছুই করতে পারে না তাদের জন্য। চাকরিটা যায় যায়—কলেজের 'এ্যাফিলিয়েশন' হচ্ছে না, পাশের হার খারাপ, হয়তো মাস দুয়েকের মধ্যে শিক্ষকদের বেতনও বন্ধ হয়ে যাবে। তবু 'সোর্স আর উদ্যমের' অভাবে আবদুল খালেক কিছু করে উঠতে পারে না। কলেজের সহকর্মীরা সবাই 'স্থূল, পরশ্রীকাতর,

লোভী, অসৎ।'[৬৩] আর ছাত্ররা 'পকেটে সিগ্রেটের প্যাকেট ঠেলে বেরুনো একরাশ ভ্যাদামার্কা ছেলে।'[৬৪] অথচ পোকাদের শৈশবে 'সবকিছু ছিল থিতানো। কোথাও কোনো কোলাহল নেই, উপদ্রব নেই,...।'[৬৫] বিষণ্ন আবদুল খালেক গ্রামের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে বর্ষার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। স্ত্রীর সঙ্গে মাকে মেলাতে চেষ্টা করে। কিন্তু অনেক তফাৎ। মামার আশ্রিত হয়ে বেড়ে ওঠা রেখার মনে মায়ের মতো মায়া নেই। মায়ের গানের কলিতে 'ভরদুপুরেও আকাশে চাঁদ ওঠে, সব রোগের নিরাময় ঘটে, সব পাপ ধুয়ে যায়, জগৎ-সংসার ভেসে যায়।'[৬৬] আবদুল খালেক স্ত্রীর শীতল উৎসাহে মাকে কাছে রাখার সাহস পায় না। কিছুই করতে পারে না। সে 'ভেবেছে এতো অনীহা কেন রেখার, এতো অশ্রদ্ধা কেন। ভেতর থেকে ভাঙা, যথাসর্বস্ব খোয়ানো, আর কখনো কারও কাছে যার কোনো দাবি নেই, এমন একটা নিরাপদ মানুষকেও রেখা একদিনের জন্যে ঠাঁই দিতে পারলো না।'[৬৭] শুধু আবদুল খালেককে ঘরের মানুষই পীড়িত করে না, পারিপার্শ্বিকতাও কষ্ট দেয়। যেমন: হিন্দুর সম্পত্তি দখলকারী আফজালকে ভীষণ অপছন্দ তার। অথচ স্ত্রী চায় সে আফজালের সাথে ব্যবসা করুক। এসব টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পেতে মরণ ঢালির নৌকায় স্বামী-স্ত্রী ভ্রমণে বের হয়। দুজন দুজনার অতীত উজাড় করে দিয়ে বর্তমানকে সুন্দর করে গোছাতে চায়। প্রকৃতি তার অকৃত্রিম উদারতা দিয়ে দুটো মানুষকে আবারও এক গ্রন্থিতে বাঁধার চেষ্টা করে। কিন্তু সব আয়োজনই প্রায় ব্যর্থ হয়ে যায়।

উপন্যাসের শেষ অংশে এসে আবদুল খালেকের উপলব্ধি, 'সেই বোধহয় প্রথম তার ছিঁড়ে গেল সবকিছুর, সে তার আর কখনো জোড়া লাগলো না। আর কখনো জোড়া লাগবে না।'[৬৮] এবং উপন্যাসের শেষে তন্দ্রাচ্ছন্ন আবদুল খালেকের কাছে স্ত্রী রেখা হয়ে যায় শৈশবের মাধুরী। বলে, 'আমাকে কোলে নাও মাধুরী—।'[৬৯] এভাবে উপন্যাস জুড়ে শৈশব তার মায়াময় আবেগে জড়িয়ে রাখে আবদুল খালেককে।

> *কালো বরফে* এই স্মৃতিকাতর মানুষের আরোগ্যাতীত দুঃখবেদনার সান্ত্বনাহীন ছবি তিনি (মাহমুদুল হক) হৃদয়ের গভীরতম তল থেকে তুলে এনে কথামালায় জীবন্ত করে তোলেন। পড়তে পড়তে মনে হয়, কোনো ভান নেই এতে। অনুভবের সততায় খাদ নেই এতটুকু। জমাটবাঁধা স্মৃতি হিমঘরের বরফের মতো। তাতে আলো পড়েনি কতদিন। পরতে পরতে অন্ধকার মেখে মেখে তা কালো।[৭০]

*কালো বরফ*-এ ঔপন্যাসিক মাহমুদুল হক বাস্তবতার ভেতরে আরও এক বাস্তবতার সন্ধানে ব্যাপৃত। যেটাকে অন্তর্বাস্তবতাও বলা যায়। চল্লিশ, পঞ্চাশ বা ষাটের দশকের কথাসাহিত্যে কাহিনির যে বর্ণনাধর্মিতা কিংবা সামাজিক বিভিন্ন সংকটের রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় সেখানে এক নতুনত্বের স্বাদ আনেন মাহমুদুল হক। নিছক কাহিনির তরল উপস্থাপনা নয় কিংবা চরিত্র নির্মাণেও বাইরের ঘটনার প্রাধান্য নয়, তিনি দেখান কাহিনির ভেতরের কাহিনি। একটি ঘটনা কী করে মানুষকে প্রভাবিত করে বাইরে ও ভেতরে। বর্তমানের সংকট থেকে বাঁচতে মাহমুদুল হকের চরিত্ররা বাস্তব থেকে পালিয়ে যায় না তবে বাস্তবকে উপেক্ষা করার জন্য বারবার ডুব দেয় শৈশবে। সবাই নিঃসঙ্গ, স্মৃতিকাতর, নস্টালজিক অনুভবে আচ্ছন্ন বিষণ্ন মানুষ। নিজেকে সবসময় ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায় [৭১] সচেতন কথাশিল্পী মাহমুদুল হকের প্রিয় লেখা *কালো বরফ*। তিনি বাহুল্যহীন, মেদহীন ঝরঝরে এই উপন্যাসটি লিখে তৃপ্তি পেয়েছিলেন।[৭২] '৪৭-এর দেশবিভাগের জটিল সমীকরণের চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে মাহমুদুল হক এই বিভাজনের প্রভাব ব্যক্তিমানুষকে ভেতর ও বাইরে থেকে কতটা বিপর্যস্ত

করেছিলো তা তুলে ধরেন পরম মমতায়। ব্যক্তির হৃদয়ের অনিঃশেষ রক্তক্ষরণের করুণ গাঁথা *কালো বরফ*।

পঞ্চম উপন্যাস *মাটির জাহাজ*। রচনাকাল ১৯৭৭ সাল। গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা এই উপন্যাসে ঢাকা থেকে নারী-ব্যবসায়ী জয়নাল—যে নিজের পরিচয় দেয় 'লেদার বিজনেসম্যান' বলে, তালতলা গ্রামে আসে দেহ ব্যবসায়ে ব্যবহার করার জন্য নতুন মেয়ের সন্ধানে। লোক দেখানো বিয়ে করে জয়নাল গ্রাম থেকে মেয়ে নিয়ে যায় শহরে। গ্রামে তার সহযোগী মনোহর। সাথে আরো আছে দেখাইবিবি, নাদেরালি, জীবন ঢালি প্রমুখ। নারী পাচারে সিদ্ধহস্ত সবাই। কুসুম নামের একটি মেয়েকে নিয়ে ঢাকা অভিমুখে রওনা হয়ে গল্প শেষ। গল্পের যে মোহনীয়তা *কালো বরফ* উপন্যাসে ছিলো এখানে সেটা কিছুটা নিস্তেজ। আমরা জানি, 'জীবনের রহস্যময়তা, প্রকৃতির রহস্যময়তা, ব্যক্তিমানুষের ভাবনাজগতের রহস্যময়তা মাহমুদুল হকের উপন্যাসের আখ্যানের জগতে নিয়ে আসে ভিন্ন এক মাত্রা, ভিন্ন এক পাঠ ও পাঠান্তর।'[৭৩] সে বিচারে খুব সাধারণ দুজন মানুষ জয়নাল ও মনোহরের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে অত্যন্ত মমত্বের সঙ্গে মাহমুদুল হক রূপায়িত করেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে এই উপন্যাসটি রচিত হয়। কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে এখানে প্রাধান্য দেয়া হয় নি। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে 'রক্ষী বাহিনী', 'ঝাঁঝরা পার্টি'—এদের দ্বারা ব্যক্তিমানুষের জীবন বিপন্ন হওয়ার কথা আসে।

> এই সময় পেট বোঝাই রক্ষীবাহিনী নিয়ে একটা লঞ্চ ঘাটে ভেড়ে। . . . লাফিয়ে লাফিয়ে ধুপধাপ ক'রে নামতে থাকে জলপাই রঙের পোশাকে মোড়া রক্ষীরা। জয়নালের মনে হয় মড়মড় করে হাড়-পাঁজর সব গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, বুটসুদ্ধ লাফিয়ে পড়ছে বুকের ওপর, এত আয়োজনের সব লক্ষ্যই সে। . . . ঘাটের কাছেই ক্যাম্প বসেছে রক্ষীদের, শুনেছে আগেই। সন্ধের পরেই আর ঘর থেকে কেউ বেরোয় না, গুম খুন, ডাকাতি, গোলাগুলির ঝামেলায় অবস্থাপন্নদের অনেকেই এখন গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে চাক বেঁধেছে। ...কাউকে তেমন সন্দেহজনক মনে হলে সোজা ক্যাম্পে ভরা হয়, তারপর যার নাম আখছেলাই, আখমাড়াই—।[৭৪]

রক্ষী বাহিনীর এই দৌরাত্ম্যের সাথে সাথে আছে বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনৈতিক দলের লোকজনের উৎপাত। মনোহর বলে:

> দিনকাল খুব খারাপ জয়নাল ভাই, খুব খারাপ। গাঁয়ে তো আর থাকো না, বুঝবে কি। ...দলও বহুত কিসিমের। চাঁদা দাও, তাহলে ধড়ের ওপরে মাথাটি আছে। না দিলে নেই। দিনের বেলা একদল, রাতের বেলা আরেক দল; অস্ত্রফস্ত্র তো সব খোলামকুচি, এই আমার মতো লগিঠেলা আধমরাকেও কালেভদ্রে চাঁদা দিতে হয়।[৭৫]

শুধু কি তাই—আরো একদল আছে যারা মুখে কালো কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে রাতের বেলা জমায়েত হয়। বক্তৃতা করে, কাকে, কোথায়, কেন মেরেছে তার ব্যাখ্যা দেয়, গুলি ফাটায়। অবৈধ অস্ত্র আর কিছু মানুষের খাম-খেয়ালিপনার কাছে জয়নাল মনোহরের মতো মানুষরা জিম্মি হয়ে পড়ে। গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি নগরজীবনের বিভিন্ন বিষয়ও জায়গা করে নেয়। রাজনৈতিক তৎপরতা দুটো ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নভাবে ফুটে ওঠে। মেয়ের দালালি করতে গিয়ে জয়নাল মনোহরদের জীবনে যেসব সংকট দেখা দেয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিষয়গুলো উঠে আসে। শহরের মানুষের লালসার ক্ষুধা মেটানোর জন্য, গ্রাম থেকে নারী পাচার হয় শহরে। এই চিত্রটি অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে আঁকেন মাহমুদুল

হক। সেই অন্ধকারজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ফুটে ওঠে এই উপন্যাসে। পতিতালয়ের বিগতযৌবনা আলমাছি বিবিকে জয়নাল ঠিক ভালোবাসে না, সমীহ করে, 'তা আলমাছি এক সময় দিয়েছেও অনেক, তখন তার যৌবন ছিলো, সেটা ভাঙিয়ে অনেক কোর্মাপোলাও খেয়েছে সে, এখন না পারে গিলতে, না ওগরাতে।'[৭৬] আছে বুবি, নতুন শিকার জীবন ঢালির মেয়ে কুসুম, যাকে লোকদেখানো বিয়ে করে শহরে ব্যবসার জন্য নিয়ে যেতে আসে জয়নাল। অনেক পুরনো এই পদ্ধতি। যুগ যুগ ধরে এভাবেই নারী শিকার হয়ে আসছে পুরুষের বঞ্চনার। এর কোনো প্রতিকার নেই। আসলে এরা বিচার চায়ও না। কার কাছে চাইবে, বেঁচে থাকার কোনো অবলম্বনই যাদের নেই তাদের আবার সম্মান। 'ফ্যানে-ভাতে আর আমানি' ছাড়া যাদের কিছু জোটে না তাদের দেহের গঠন জয়নালদের ব্যবসার মূলধন। শুধু ভাতের জন্য এখনো নারীকে সম্ভ্রম বিক্রি করতে হয়। অথচ কিছুদিন পূর্বেই একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়। মনোহর বা জয়নাল কেউই চায় না জীবনের এই অন্ধকারে বেঁচে থাকতে। এরা একটা সুখী, সুন্দর, স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের স্বপ্ন দেখে। একজন নারী-ব্যবসায়ীও জীবনকে বিচিত্রভাবে দেখার চেষ্টা করে। তার চেতনার স্তরটি একরৈখিক নয়। মাহমুদুল হকের বিশেষত্ব এখানেই। চরিত্রের বৈচিত্র্য বা রহস্যময়তাই শিল্পের প্রাণ। নিজের এ অন্ধকার জীবন সম্পর্কে জয়নালের ভাবনা:

> ঝকমারি আগেও ছিল, সে আর কি, বেশির পক্ষে চাকুছুরি। আর এখন তোমার মাল সামলাবে, না কোন্‌টা কাস্টমার কোন্‌টা হাইজ্যাকার তাই হিসেব করবে, না স্টেনগান পিস্তল সামলাবে। শালার এ রকম জীবন যেন আর কোনো মানুষের না হয়, এটা শালা একটা জীবন! মুতে দেই আমি এর মুখে।[৭৭]

এই জীবন থেকে মুক্তির কথাও জয়নাল ভাবে, 'চিরকাল তো আর এইসব নিয়ে থাকবো না, শেষ জীবনটা জমাজমি চাষাবাদ এইসব নিয়েই থাকতে চাই।'[৭৮] নিরুপদ্রব জীবনের স্বপ্ন দেখলেও তা অধরাই রয়ে যায়। কেননা:

> পাপের জীবন। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে দিয়ে ভালো হয়ে যাই, এ আর ভালো লাগে না। জুয়োটা তো ছাড়লাম, এসব কাজও ছাড়বো ছাড়বো করি, কিন্তু ঐ পর্যন্ত! কি ক'রে খাবো, প্রাণে বাঁচবো, আর কিছু তো শিখি নি, আর কিছু বুঝি নি, এখন এই ঘানিকল থেকে বেরুনো সহজ নয়।[৭৯]

জয়নালরা বেরুতে পারে না। কেননা জীবনও তাদের ঠকিয়ে এভাবেই তৈরি করেছে। জয়নালের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়াশোনা করতে পারে নি। বাবা মারা যায়, মা 'নিকেয়' বসে, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ জানা নেই। জয়নালের মনে হয় এর চেয়ে 'বেজন্মারা'ও ভালো। ভাগ্যের কাছে নিজেকে সঁপে দেয়। কিন্তু অন্ধকারের জীবন থেকে আলোর স্বপ্ন দেখতে পারে, মাহমুদুল হক এমনই করে আঁকেন তাঁর পাত্র-পাত্রীদের। মনোহরও স্বপ্ন দেখে, 'দেখি বিরাট একটা হোটেল, তার চূড়ায় ইয়া সাইনবোর্ড, দুটো পরী ফুলের মালা নিয়ে ঝুলে আছে দু'পাশে, সেখানে লেখা মনোহর ভাণ্ডার।'[৮০] এখানেও সেই সচ্ছলতার স্বপ্ন দুচোখ জুড়ে। বর্ষায় গ্রামীণ প্রকৃতিও এদের ভাবুক করে তোলে। দুপাশের ঘনজঙ্গলে ভরা থইথই পানিতে নৌকায় যেতে যেতে জয়নালের মনে হয়, 'কতোদিন এরকম গা ছেড়ে দিয়ে সে শোয় নি, আকাশ দেখে নি, লতা পাতা বুনো ফুল দেখে নি।'[৮১] এমনভাবে ভাবতে পারে বলেই জয়নাল বিশ্বাস করে জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে 'একটা পশু হওয়া চাই।'[৮২] সেটা সে হতে পারে না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের বিধ্বস্ত মূল্যবোধ আর নেতিবাচকতার ধারক জয়নাল একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় না। এজন্য একজন নারী-ব্যবসায়ীও মাহমুদুল হকের

কলমে পাঠকের সহানুভূতি লাভ করে। সখীসোনা বা কুসুম বা হেনা—এরা সেই নারীদের প্রতিনিধি যাদের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকতে হয়। পরিবার বা সমাজ কেউই তাদের সম্মানের জীবন দেয় না। নারীর দেহ এখানে জয়নাল মনোহরদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। শেষ পর্যন্ত পাঠকের কানে বাজতে থাকে জয়নাল, মনোহর, কুসুম, হেনা, সখীসোনা সবারই মর্মন্তুদ কান্নার ধ্বনি, বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম, আর ভালো থাকার ইচ্ছার স্বপ্নমাখানো অর্কেস্ট্রা।

ষষ্ঠ উপন্যাস *খেলাঘর*। রচনাকাল ১৪-২০ আগস্ট ১৯৭৮। এই উপন্যাসে প্রতিটি অধ্যায়ের কাহিনির সাথে সঙ্গতি রেখে নামকরণ করা হয়। *খেলাঘর*-এর আখ্যানভাগ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের। রেহানা ওরফে ঝুমি ওরফে আন্না ওরফে গাব্বু ওরফে টেঁপি ওরফে লতানাম্নী মেয়েটি ঢাকা ছেড়ে ইছাপুরা গ্রামে আসে আরো কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে। সেখান থেকে মিঠুসারের আদিনাথের ভিটেয় উঠে— চাচাতো ভাই টুনুর বন্ধু বেসরকারি কলেজের শিক্ষক ইয়াকুবের সাথে। গ্রামীণ প্রকৃতি তার সমস্ত উদারতা, চপলতা, স্নিগ্ধতা আর মায়া নিয়ে ঘিরে রাখে এই বহু বছরের পুরনো আদিনাথের ভিটেকে। সেখানেই স্বপ্নের খেলাঘর গড়ে তোলে রেহানা ইয়াকুবের সঙ্গে। প্রকৃতির অকৃত্রিম স্নিগ্ধতায় যখন তাদের খেলাঘর ভালোবাসার স্পর্শ পেতে শুরু করে কেবল ঠিক তখন আচমকা এক ঝড় এসে শেকড়সমেত খেলাঘর উপড়ে ফেলে। বিষণ্ন রেহানা একবারও ভেঙে যাওয়া খেলাঘরের দিকে পিছু ফেরে নি। কিন্তু একরাশ কষ্ট নিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায় ইয়াকুব। তার হৃদয়ে মাঝরাত্রির ঘন অন্ধকার নেমে আসে, সাথে সাথে পাঠকের হৃদয়েও। আদিনাথের ভিটেয় একা ইয়াকুব দেখে—'সারা বারান্দায় আন্নার পায়ের ছাপ। ইচ্ছে হয় ওর ওপর গাল পেতে শুয়ে থাকি। সবকিছু ফাঁকা মনে হয়। ঝোড়ো বাতাস শূন্য কোঠায় হাহাকার করে। মনে হয় প্রতিটি গাছ সজল চোখে বিধ্বস্ত বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে।'[৮৩]

বাড়িটা বিধ্বস্ত হয়, খেলাঘর ভেঙে যায় উপন্যাসের শেষের দিকে টুনু, জানায় রেহানা স্বদেশভূমিকে দান করেছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঢাকায় এক হোস্টেলে থেকে পড়তো রেহানা, লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে পাকবাহিনী তাকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর কোনো এক ভোরবেলায় রাস্তা থেকে তুলে রেহানাকে কেউ হাসপাতালে পৌঁছে দেয়। সেখান থেকে চাচাতো ভাই টুনু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সাহায্যে তাকে উদ্ধার করে। এই দুর্ঘটনার পর থেকে রেহানা বারবার ফিরে যায় অতীতে অর্থাৎ তার শৈশবে। ইয়াকুব কিংবা পাঠক কেউই অনর্গল কথা বলে যাওয়া মেয়েটিকে দেখে বোঝে না সে ভেতরে ভেতরে কতটা বিধ্বস্ত। বারবার নস্টালজিক হয়ে পড়ে রেহানা। নিজের ডাক নাম, খেলার সাথীরা তার কথায় উঠে আসে:

> দাদাভাই ডাকতো ঝুমি, দিদামণি ডাকতো আন্না, মামা ডাকতো গাব্বু, স্কুলের মেয়েরা ডাকতো টেঁপি, সখী পাতিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে, সে নাম দিয়েছিল লতা। আমি তার নাম দিয়েছিলাম পাতা। দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে কেউ কেউ ছড়া কেটে বলতো, লতাপাতা যায়, ফিরে ফিরে চায়। পাতাটা ছিল ভারি মুখ ফোঁড়, ও বলতো—লতাপাতা যায়, গরু পিছে ধায়। . . . আমাদের ক্লাসের একটি ছেলের নাম ছিল বাবু। বাবুদের বাড়িতে ছিল ফলশা গাছ। আমি আর পাতা বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিলাম, যা ভালোবাসতাম ফলশা![৮৪]

রেহানার শৈশবের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে দাদাভাই আর দিদামণি। বাবা-মা নেই। টুনুর কথায় জানা যায় সে বংশের একমাত্র মেয়ে। যখন ও কোলের মা অন্যের সাথে ঘর বাঁধে আর

লজ্জায় বাবা আত্মহত্যা করে। দাদা-দাদির কাছে মানুষ। তাই তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দাদাভাই আর দিদামণি তাদের সমস্ত কোমলতা নিয়ে হাজির:

> ফুলের সময় রোজ আমি দাদাভাইকে মালা গেঁথে পরাতাম। দাদাভাই গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলতো, দে দে, যত দিবি তত পাবি, . . . ফুলের মালা দিলে ফুলের মালা পাবি, জীবন ফুলের মতো হবে, ঝলমল করবে, হাসিখুশি থাকবে, সুগন্ধে ভুরভুর করবে;... ।[৮৫]

দাদাভাইয়ের আশীর্বাদ রেহানার জীবনে পুরোটা ফলে না। ফুলের মতো তার জীবন হয়। কিন্তু ঝলমল করতে পারে নি, হাসিখুশি থাকতে পারে নি, সুগন্ধও ভুরভুর করে নি। বরং তার জীবন হয় অন্তঃসারশূন্য, অর্থহীন, গন্ধহীন শুকনো ফুলের মতো, বোঁটায় লেগে আছে কিন্তু ঝরে পড়ার অপেক্ষায়। বিষণ্ন দেশ তার কাছ থেকে সমস্ত সুগন্ধ, হাসি আর আলো ছিনিয়ে নেয়। যুদ্ধাক্রান্ত এই নারী নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয় আপাতভাবে। কিন্তু তার চেতনাতেও একটা যুদ্ধ-বিরোধী বোধ কাজ করে। ইয়াকুবকে সে বলে, 'আসল ঝগড়া দেখলে ও-কথা তুলতে না, ঝগড়া কাকে বলে জানো-ই না। গোলা-বন্দুক-বারুদ ছাড়া আবার ঝগড়া চলে নাকি; আর তো সব ঝগড়া-ঝগড়া খেলা!'[৮৬] ঝগড়ার নামে যুদ্ধের কথাই আসলে বলে। কেননা ঝগড়ার ভয়াবহতা তাকে প্রায় ধ্বংসের কাছে নিয়ে যায়। মানুষ ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কখনো সাহসী হয়ে ওঠে কখনোবা নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। রেহানা দ্বিতীয় কাজটা করে। এর প্রকাশ ঘটে তার শুয়ে পড়ার ভঙ্গিতে। যেমন : 'প্রথমে পা লম্বা করে শুলেও দেখতে-না-দেখতে এক সময় দীনদুঃখীর মতো কেমন যেন দলামোচড়া হয়ে যায়; অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে।'[৮৭] কিন্তু যুদ্ধের বীভৎসতাও তার চেতনায় আছে। কবিরাজবাড়িতে সে যখন আশ্রয় নিয়েছিলো ঢাকা থেকে ফিরে, তখনকার একটা ঘটনা সে ইয়াকুবকে শোনায়। '... কি বিচ্ছিরি বিড়ালগুলো, কালকে করেছে কি একটা টুনটুনি পাখি ধরে বাতাবিলেবু–গাছতলায় বসে দিব্যি আয়েস করে তাকে জ্যান্ত ছিঁড়ে–ছিঁড়ে খেলো, মাগো—'।"[৮৮] তাই চেতনায় সক্রিয় এই নারী মাহমুদুল হকের অন্য চরিত্রের মতো কমবেশি নস্টালজিয়ায় ভোগে। সবকিছু হারিয়ে নিঃস্ব এই নারী বিমুগ্ধ শৈশবের স্বপ্নময় দিনগুলোতে ডুবে থাকতে চায়। মুক্তিযুদ্ধকে পটভূমি করে রচনা যেহেতু *খেলাঘর* তাই মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ আসে তবে যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনার দিকে লেখকের আগ্রহ কম। টুনুর চিঠি এবং কথায়, মুকুলের বাস্তব অভিজ্ঞতায় যুদ্ধের খণ্ডচিত্র দেখানো হয়। যেমন:

> কাউলকা তালতলা ঘাটের ক্যাম্পডারে অক্করে মেছমার কইরা দিয়া গ্যাছে ভূতেরা। সব কয়টারে অক্করে ছিদ্রি ছিদ্রি কইরা দিয়া গ্যাছে—' হাত-পা নেড়ে প্রবল উৎসাহে মুকুল কথার খৈ ফোটাতে থাকে, 'বাহিরঘাটার দিক থিকা আয়া অক্করে তুলকালাম কাণ্ড বাজায়া গ্যাছে ভূতেরা, রাজাকার-ফাজাকার মিলিশিয়া-ফিলিশিয়া ব্যাক ফিনিশ!'[৮৯]

ইয়াকুব কিন্তু এই সংকটকালেও নিস্পৃহ। নিজের ছেঁড়াখোঁড়া জীবন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সে—বাইরের পৃথিবীর আগুনঝরানো ঘটনা তাকে ছুঁয়ে গেলেও মন্ত্রমুগ্ধ করতে পারে না। তবে কিন্তু একটা রয়ে যায়। রেহানার দুর্ঘটনার বিবরণ টুনুর কাছে শুনে ইয়াকুবের ভাবনা এরকম, 'সবকিছু তেতো হয়ে যায়। মনে হলো এই মুহূর্তে টুনু করাচি পুলিশের চেয়েও খারাপ।'[৯০] এই অন্তর্দহনও কম নয়। আর বেশি কিছুর প্রয়োজনও পড়ে না একটা চরিত্রের মনোজগতের হদিশ পাওয়ার জন্য। মুকুলের কাছে সশস্ত্র সংগ্রামের বাস্তব বর্ণনা শুনে উপন্যাসের শেষ বাক্যটিতে ইয়াকুব বলে, 'দেখছি সবকিছুই।'[৯১] সময়টাই তেমন, ইচ্ছে করলেও চোখ বন্ধ করে থাকা যায় না। যুদ্ধ কোনো না কোনোভাবে সবাইকে আক্রমণ করে। এর ধ্বংসের স্পর্শ কাউকে না ছুঁয়ে যায় না। মাহমুদুল হক সেটাই দেখাতে চান। তিনি ইঙ্গিতময় উপস্থাপনায় মুক্তিযুদ্ধকে গেঁথে দেন নর-নারীর জীবনে। তাইতো রেহানার দেয়া

ঝগড়ার ব্যাখ্যার মধ্যে যুদ্ধ আসে নান্দনিকভাবে—এভাবেই মাহমুদুল হক ইতিহাস, সময়কে একসূত্রে রেখে শিল্প তৈরি করেন। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কিছু সাহসী তরুণের জীবনপণ করার প্রসঙ্গ যেমন আসে ঠিক তেমনি সেসব মানুষের কথাও আসে যারা একটু তফাতে থেকে সবকিছু দেখে, গল্প করে উত্তপ্ত আগুনের। কিন্তু আঁচ লাগতেই নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়। ইয়াকুবের আত্মসমালোচনাতে উঠে আসে, 'এই আমার মতো হাত-পা-গোটানো উদ্যমহীন কাতর মানুষজনের সংখ্যাই তো বেশি।'[৯২] হ্যাঁ, যুদ্ধের সময় সবসময় একটা শ্রেণি সকলের নিরাপত্তার জন্য সাহসী হয়ে ওঠে যেমন ঠিক তেমন এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে। মাহমুদুল হকের জহুরির চোখে কোনোকিছুই বাদ যায় না, শেকড়সমেত উঠে আসে। মুক্তিযুদ্ধ তার সব ভয়াবহতা আর সংকট নিয়ে হাজির হলেও মাহমুদুল হক শেষ পর্যন্ত নিস্পৃহ ব্যক্তিহৃদয়ের রক্তক্ষরণকেই বহু তাৎপর্যে উপস্থাপন করেন। এই আখ্যানের প্রাণ রেহানার সাবলীল স্বতঃস্ফূর্ত কথাবার্তা। কিন্তু শেষে এসে যখন পাঠক তার অপ্রকৃতিস্থতার খবর জানে তখন গল্পের মোড়ই পাল্টে যায়। গল্পের বিবর্তন মাহমুদুল হকের শিল্প নির্মাণের অন্যতম কৌশল। তাই পাঠক মনোযোগী না হলে সেই বিবর্তনের সাথে সাথে এগুতে পারবে না এবং মাহমুদুল হকের বিশেষত্বকে আস্বাদন করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত মাহমুদুল হকের *খেলাঘর* পড়ে পাঠক হৃদয়ে অনুরণিত হয় এক অসঙ্কোচ, অপাপবিদ্ধা নারীর দেশকে সব দিয়ে, নিঃস্ব হয়ে, শৈশবের আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দেয়ার চেষ্টার নিঃশব্দ লড়াই। রেহানা ফিরে যায় টুনুর সাথে ইয়াকুব বা স্বপ্নের খেলাঘরকে একবারও পিছু না দেখে। আসলে সে ভুলে যেতে চায় দুর্ঘটনাকে। কেননা, এই অপাপবিদ্ধা নারী চলেছে আগামীর আরেকটি স্বপ্নের খেলাঘর গড়তে যদি তার প্রিয় স্বদেশ সে সুযোগ তাকে দেয়।

সপ্তম উপন্যাস *অশরীরী*। প্রথম প্রকাশ *রোববার*-এর ঈদ সংখ্যায়, ২৬ আগস্ট ১৯৭৯-তে। এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ গড়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর টর্চার সেলে এক বন্দিকে কেন্দ্র করে যার নাম আম্বিয়া। সারা শরীরে তার অত্যাচারের চিহ্ন, যেটা পাকিস্তানিদের দেয়া। কিন্তু জীবনও তাকে কম যন্ত্রণা দেয় নি। ব্যক্তিগত জীবনে প্রায় সম্পূর্ণ উদ্যমহীন, কাতর একজন মানুষ। স্ত্রী তাহেরা আর শিশু সন্তান পুপুসোনাকে নিয়ে তার সংসার ছিলো। কাজ করতো পত্রিকা অফিসে সাহিত্যপাতা দেখার। কোনো ভালোলাগা থেকে নয় চাকরি বলেই সেটা করা। স্ত্রী তাহেরার অবিশ্বাস আর অমানবিক আচরণ সংসারটাকে ভেঙে টুকরো করে ফেলে। অথচ কখনো আম্বিয়া দায় নেয় নি স্ত্রীর ভুল ভাঙানোর। কিন্তু মানুষটি আগাগোড়া এমনটা ছিলো না। এই আম্বিয়া একজন কুমারী মাকে বিয়ে করার দৃঢ়তা দেখায় একসময়। এর বেশির ভাগটাই মানবিক কারণে আর অল্পভাগ ভালোলাগা থেকে। অথচ তাকে বিয়ের পরে ভেঙে যাওয়া সংসার জোড়া লাগানোর চেষ্টা খুব একটা করতে দেখা যায় না। কেমন যেন মনের দিক থেকে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আম্বিয়া। কোনো ব্যাপারেই সে উদ্যমী হতে পারে না। ছোটবোন আঞ্জুমের অপমানও সে সহ্য করে যায়। নিজেকে নিজের মধ্যে অকারণে গুটিয়ে নেয়।

পাকবাহিনীর টর্চার সেলে থাকা আম্বিয়া বাস্তবের নির্মমতা থেকে বের হয়ে আসে চেতনায়। আম্বিয়ার শরীরের চেয়ে মনের ক্ষতের গভীরতা অনেক বেশি। জীবনে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে অর্থহীন। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে কিংবা হয়তো কারণ ছাড়াই তাকে বন্দি জীবন কাটাতে হয়। ঠিক যেমনভাবে কোনো অন্যায় বা গর্হিত কাজ না করেই স্ত্রীর সন্দেহের রোষানলে পড়ে তার সাজানো সংসার। আম্বিয়ার জবানিতে পাকবাহিনীর অত্যাচারের বর্ণনা ফুটে ওঠে। সরাসরি যুদ্ধকালের কথা আসে, আসে তাঁর মর্মান্তিক পরিণতির কথা। এর

আগে *জীবন আমার বোন*-এ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি এবং ২৫ মার্চের কালরাতের ঘটনা আসে এবং *খেলাঘর*-এও মুক্তিযুদ্ধের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা আসে। তবে একটু বেশি প্রত্যক্ষভাবে প্রথমবার *অশরীরী*তে পাকবাহিনীর নৃশংস অত্যাচারের বর্ণনা আসে। প্রতিরোধের কথা কম। যুদ্ধ নিয়ে স্বপ্নের মায়াজাল বা ভাবালুতায় আচ্ছন্ন মানুষের কথা নেই। আছে আক্রান্ত হবার কথা। আক্রান্তদের কথা। কিন্তু সব ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে আম্বিয়ার ব্যক্তিহৃদয়ের রক্তক্ষরণের চিত্র। আম্বিয়ার স্ত্রী তাহেরা যে নিজের দোষেই সংসারে অশান্তি টেনে আনে। তাহেরা অতীতের পাপবোধ থেকে হীনম্মন্যতাতে ভোগে। তাই তার বর্তমান প্রশ্নবিদ্ধ। ঠিক এমনই আরেকটি চরিত্র আছে *অনুর পাঠশালা* উপন্যাসে অনুর মা। যে একইভাবে ইংরেজি শিক্ষকের সঙ্গে একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে স্বামীকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে নিজের হীনম্মন্যতাকে ঢাকতে সংসারে অশান্তি টেনে আনে। দুক্ষেত্রেই পুরুষ চরিত্রটি উদাসীন, দায়হীন। ব্যক্তির মনের ভেতরে প্রতিনিয়ত ভাঙাগড়ার খেলা চলে, নিজেকে নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের মতো একটা ব্যাখ্যা দিয়ে সবকিছুর মীমাংসা করতে চায়, অথচ দেখার অনেক ভুলও রয়ে যায়। এরকম এক বিনাশী চরিত্র তাহেরা। সে শুধু নিজের জীবনকে বিষময় করে নি, করে সন্তান এবং স্বামীর জীবনকেও। সংসারের তিক্ততা আম্বিয়াকে এমন এক আচ্ছন্নতার ভেতর নিয়ে যায় যে— পাকবাহিনীর অত্যাচার আর তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না তার জীবনে।

এই উপন্যাসের মূল বিষয় আম্বিয়ার ব্যক্তিজীবনের দাম্পত্যসংকট। যদিও সমান্তরালভাবে মুক্তিযুদ্ধ এসে যাওয়ায় সেটাও আম্বিয়ার ব্যক্তিজীবনের সংকটের একটা অংশ হয়ে যায়। পাকবাহিনীর টর্চার সেলে বন্দি আম্বিয়া তার গ্রাম, শৈশব, বর্তমান, চাকরি, সংসার, সংসারের সংকট এবং ভেঙে যাওয়া সংসার জোড়া লাগাতে না পারার ব্যর্থতা নিয়ে ব্যস্ত। টর্চার সেলের অত্যাচারের ব্যাপারটিও তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যেমন:

> আম্বিয়া পায়ের পাতায় পেচ্ছাব করে। বুটের ছ্যাঁচা খেয়ে-খেয়ে ডান পায়ের পাতায় দগদগে ঘা হয়ে গেছে, উষ্ণ পেচ্ছাবের ধারা গড়ালে বেশ আরাম লাগে। তাছাড়া পেচ্ছাব জিনিসটা এ্যান্টিসেপটিকও বটে, মেসে থাকতে সে সেই রকমই শুনেছে।[৯৩]

এছাড়া আত্মসমালোচনায় মুখরও হয় আম্বিয়া। বলে:

> নিছক সন্দেহবাতিক তাহেরার স্বভাবকে দিনের পর দিন উচ্চণ্ড করে তুলছে, এর কোনো ওষুধ নেই; এ ধরনের গোঁজামিল দেয়া আলস্যজর্জর পলকা-সমাধানের তলায় নীরবে মাথা পেতে দেয়াই নিজের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিল। এখন মনে হয় সেটা ছিল তার অপরাধ। অনেক কিছুই করার ছিল।[৯৪]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করে উঠতে পারে না। কেননা, 'তার ছিল মনোবেদনার ছমছমে জনহীন পথ, একা একা উদ্‌ভ্রান্তের মতো সে শুধু এই পথের ধুলোই মেখে বেড়িয়েছে।'[৯৫] এবং পরিণতিতে আম্বিয়া তার এই উদ্যমহীন ভাঙাচোরা জীবন থেকে মুক্তি চায়, মৃত্যু প্রার্থনা করে। তার এই মৃত্যু কামনার আর্তির ভেতর ধরা পড়ে চরিত্রের বিবর্তন যা আখ্যানের জন্য দরকার। সে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি হয়ে ওঠে। চেতনার গভীরে ডুবে যায় সে *নিরাপদ তন্দ্রা*-র হিরনের মতো। কিন্তু হিরন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। আম্বিয়া তার অশরীরী আত্মার মুক্তি চায়। পাকবাহিনীর এদেশীয় দোসরদের আদেশে লাশ পোঁতার জন্য গর্ত খুঁড়তে খুঁড়তে উঠে আসে আম্বিয়া। তারপর আচ্ছন্নতার ভেতর থেকে "হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাত জোড় করে আম্বিয়া বললে, 'আমাকে গুলি করে মারুন—।'"[৯৬] তার এই আকুতি পাকিস্তানীদের অত্যাচারের

নির্মমতায় অসহ্য হয়ে ওঠার জন্য যতটা—তার চেয়ে বেশি মনে হয় তার ক্ষত-বিক্ষত ব্যক্তিজীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এভাবেই মাহমুদুল হকের আখ্যানভাবনা বহুমাত্রায় ব্যঞ্জনা লাভ করে পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে।

অষ্টম তথা মাহমুদুল হকের রচিত শেষ উপন্যাস *পাতালপুরী*। প্রথম প্রকাশ *রোববার*-এর ঈদ সংখ্যায়, ১৯৮১ সালে। এই উপন্যাসের পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের দশ বছর পরের সময়। মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক আমিনুলের ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘশ্বাসে ভরা এর আখ্যানভাগ। বোদলেয়ারী প্রভাবজাত এই নিঃসঙ্গ মানুষটি ভালোবাসা হারিয়ে একাকিত্বে ভোগে। মাহমুদুল হকের অন্য চরিত্রের মতোই ডুবে থাকে নস্টালজিয়ায়। তবে এর পেছনে যুক্তিসঙ্গত কারণও রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড আমিনুলকে পীড়িত করে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তার সহযোদ্ধাদের জীবনের কাছে পরাজিত হওয়ার কাহিনি তাকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। চব্বিশ বছরের টগবগে তরুণ মুক্তিযোদ্ধা আমিনুল যুদ্ধের মাত্র দশ বছরের মধ্যে হারিয়ে ফেলে সকল উৎসাহ, উদ্যম। তাকে বর্তমান সময় ব্যথিত করে। কেননা মুক্তিযুদ্ধের সকল প্রত্যাশা প্রত্যাশাই রয়ে যায়। কোনো স্বপ্নই পূরণ হয় না। দেশের মানুষ প্রতিনিয়ত গরিব হচ্ছে। অথচ দেশের এই দুরবস্থা থেকে যিনি দেশকে উদ্ধার করতে পারতেন সেই জাতির পিতাকে হত্যা করে জাতি আজ অনাথ হয়। দেশ চলে কতকগুলো স্বার্থপর মানুষের আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায়। স্বাধীনতা-বিরোধীদের উত্থান সম্পর্কে একসময়ের দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধা আজকের পরাজিত মানুষ জামশেদের ভাবনা, 'সুযোগ এরা নিজেরা তৈরি করে নিয়েছে, একদিনে তা হয় না। স্বাধীনতার ধ্বজাধারীদের বিভেদ আর আত্মকলহের ফাটলে শিকড় চারিয়ে শাখা-প্রশাখায় বিস্তার ঘটাতে যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে এরা।'[৯৭] বেশ একটু প্রত্যক্ষভাবেই সময়ের অস্থিরতা ফুটে ওঠে এই উপন্যাসে। 'এই চারদিকে সব গুমখুন, আজ শোনো অমুককে পাওয়া যাচ্ছে না, কাল শোনো ধানক্ষেতের পাশে তমুকের লাশ পড়ে আছে, দেশে আইন-শৃঙ্খলার লোমটিও নেই,...।'[৯৮] মাহমুদুল হকের স্বভাবজাত যে ইঙ্গিতময়তা বা বাস্তবতার মধ্যে অন্য এক বাস্তবতার অন্তর্বয়ন ঘটে তাঁর আখ্যানে— সেটার কিছুটা অভাব সচেতন পাঠকের কাছে পরিলক্ষিত হবে এই উপন্যাসে। তবে আমিনুল চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার বিষয়টি লক্ষ করা যায়— যেখানে পুরনো মাহমুদুল হককে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আমিনুল, নিজে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে প্রায় পরাজিত, কিন্তু একটি পিঁপড়েকে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে জিতে যেতে দেখে উল্লসিত হয়। পুলিশের বাড়ি তল্লাশি করতে আসা দেখে ভীত হয় আমিনুল, "মায়ের কাছে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে, 'আমাকে তুমি ওদের হাতে তুলে দিও না মা, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে—।"[৯৯] এখানেই কাহিনি শেষ। এক মর্মন্তুদ অন্ধকার এসে গ্রাস করে ফেলে মুক্তিযুদ্ধের সূর্যসেনাদের। আদর্শচ্যুত জাতির করুণ জীবনকথার কোরাস *পাতালপুরী*। এখানেও অস্থির সময়কে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আমিনুলের মনোজাগতিক ক্রিয়ার গাথা।

> একবার মন তেতো হয়ে গেলে আমিনুলের সবকিছু ওলটপালট হয়ে যায়, জানা জিনিসও গুলিয়ে ফেলে, মাথার ভেতরের জট তখন এমনভাবে খুবলে-খুবলে খায় যে কারো মুখ দেখতেই ইচ্ছে করে না, মনে হয় কতগুলো বাঁদর, কতগুলো জানোয়ার, এই জঙ্গলে সে বেঁচে থাকবে কীভাবে![১০০]

আমিনুলের মাথার ভেতরের জট পাকায় আসলে অস্থির সময়। তার ধারণা:

> এত হিংসা আর গুণ্ডামির ছত্রছায়ায় মানুষ বাঁচতে পারে? কুচকাওয়াজ দেখতে দেখতে দেশের লোক রোগা-পাতলা হয়ে গেছে, ফ্যাকাশে মেরে গেছে, অথচ

> একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আজ পর্যন্ত কেউ তাদের সামনে দিতে পারলো না। যে দিতে পারত সে খুন হয়ে গেছে।[১০১]

তাই অনাথ জাতির দিকনির্দেশনাহীন এই পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তিদের কাছে আজ তার সহযোদ্ধারা পরাস্ত। বন্ধু জামশেদের স্বাধীনতা-বিরোধীদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুভয়ে ভীত চেহারা আমিনুলকে ক্ষুব্ধ করে তোলে :

> এই সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জামশেদ—একদিন যার নাম সাহসের আলোকবর্তিকা হয়ে পাশাপাশি আটটা গ্রামের মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াইকে কত গৌরবের বলে বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করাতে পেরেছিল। আজ কোথায় সেই সাহস কোথায়ই-বা সেই বিশ্বাস? একটা নৈতিকতা বিবর্জিত হৃদয়হীন নির্বোধ জাতি কতগুলো পেশাদার বিকারগ্রস্ত ধাপ্পাবাজের প্ররোচনায় তার আপন সন্তানদের কোল থেকে কত দূরেই-না ঠেলে দিয়েছে।[১০২]

স্বাধীনতা আমিনুলের কাছে অর্থহীন হয়ে ওঠে। শুধু কি দেশ আমিনুলকে হতাশ করেছে, ভালোবাসার মানুষ রানুও তো কম ঠকায়নি তাকে। 'রানু ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিয়েছিল, তারপর পনেরো দিনের চুক্তিতে এক সৌদি ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিয়েতে বসেছে, পেয়েছে ষাট ভরি সোনা আর নগদ বিশ হাজার টাকা, বাচ্চাদের একটা স্কুল খুলেছে এখন শান্তিনগরে,...।'[১০৩] এই কাহিনি উপস্থাপনায় দক্ষ শিল্পী মাহমুদুল হকের স্পর্শ কিছুটা ধোঁয়াশায় ভরা। কেননা ততদিনে লেখালেখিতে তাঁর ক্লান্তি এসেছে। এ ব্যাপারে *পাতালপুরী*-র প্রকাশক মফিদুল হক বলেন:

> সাময়িকপত্রের ঈদসংখ্যায় প্রথম প্রকাশকালে, পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, শেষ মুহূর্তে প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনের চাপে উপন্যাসের অবস্থান হয়ে পড়ে কুণ্ঠিত এবং কাটছাঁট করে প্রকাশিত হয় 'পাতালপুরী'। সেই সাথে খোয়া যায় মূল রচনা, যার হদিশ করতেও বিশেষ তৎপর ছিলেন না মাহমুদুল হক। ...আমরা সচেতন রয়েছি বর্তমান গ্রন্থরূপ অপূর্ণাঙ্গ এবং লেখকের ইচ্ছামূলক নয়, কিন্তু তাঁর সৃষ্টিশীলতা ও ভাবজগতের পরিচয় জানতে এই কর্তিত রূপটির কোনো বিকল্প নেই।[১০৪]

প্রকাশক যতটা অপূর্ণাঙ্গ বলেন ততটা নয় *পাতালপুরী*। তবে মাহমুদুল হকের পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ বঞ্চিত *পাতালপুরী*, এতটুকু বলা যেতে পারে।

এভাবেই কথাশিল্পী মাহমুদুল হকের ক্যানভাসে ফুটে ওঠে সমকালীনতা, সমাজ-মনস্কতা, আর্থ-রাজনৈতিক চেতনা এবং ব্যক্তিমানুষ। এখানে বেঁচে থাকার জন্য নারীর শরীরকে পুঁজি করতে হয়, বেঁচে থাকার জন্য শৈশবে ডুব দিতে হয়, বেঁচে থাকার জন্য মৃত্যু কামনা করতে হয় এবং বেঁচে থাকার জন্য নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয়। উপন্যাসের শরীর জুড়ে এই মর্মন্তুদ বেদনা নিয়ে বেঁচে থাকার নিরন্তর চেষ্টা চালায় মাহমুদুল হকের চরিত্ররা। এরা সবাই গভীর নৈঃসঙ্গ্যবোধে তাড়িত। তিনি নিজের সৃষ্ট চরিত্রদের সম্পর্কে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'প্রত্যেকটি ক্যারাকটার নিজ থেকে উন্মূল। বেসিক্যালি আমি মনে করি মানুষ উন্মূল,...। একটা ঠিকানা প্রত্যেকেরই আছে, প্রত্যেকেরই গৃহ আছে, সংসারও আছে কিন্তু বোঝায় যায় না সেই সংসারে সে আছে।'[১০৫] হয়তো পারিপার্শ্বিকতা তাদের উন্মূল করে দেয়। এই পারিপার্শ্বিকতা কখনো দেখা যায়, কখনো বুঝে নিতে হয় আর কখনোবা অবাস্তবে ঢাকা থাকে মাহমুদুল হকের আখ্যানে। এজন্যই তাঁর আখ্যানগুলো ইঙ্গিতময়তায় ভরা, রহস্যে আচ্ছন্ন। অনু, হিরন, খোকা, আবদুল খালেক, জয়নাল, রেহানা বা আম্বিয়া কিংবা আমিনুল কেউই পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। সবারই মধ্যে কিছু না কিছু

অস্পষ্টতা রয়েছে। মাহমুদুল হক এই ইঙ্গিতময়তারই রূপকার। আর তাই বলা যায় মাহমুদুল হকও বিশ্বাস করেন আসলে সব মানুষ একা।

> মানুষের মনের এই নিঃসঙ্গতার উপলব্ধি মাহমুদুল হকের আখ্যানের জগতের মৌল উপাদান। এই নিঃসঙ্গতা ও উন্মূলতার বিষয়টি কাহিনী বা চরিত্রের বিষয় নয় বরং এটি জীবন-জিজ্ঞাসার বিষয়, জীবনকে দেখার দৃষ্টিকোণ ও দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়।[১০৬]

নিঃসঙ্গ মানুষের মনোজগতের রূপকার মাহমুদুল হক সব উপন্যাসেই তার প্রকাশ দেখান। অনু, হীরন, খোকা, পোকা ওরফে আবদুল খালেক—সবাই একা মানুষ। *অনুর পাঠশালায়* দেখা যায় বিষণ্ন কিশোর অনুর একাকিত্বে ভরা জীবনের অর্কেস্ট্রা। *নিরাপদ তন্দ্রা*-য় কাল থেকে কালান্তরে বয়ে চলা পুরুষের হাতে নারীর যে অসম্মান তাই-ই রূপায়িত হয়। ভালোবাসার জন্য সব হারিয়ে নিঃস্ব হিরন শেষ পর্যন্ত একা মনের চেতনস্তরে না হোক অবচেতনে তৈরি করে স্বপ্নের স্বর্গ। *জীবন আমার বোন*-এ দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধ শুরুর উত্তাল মুহূর্তে সবাই যখন একসূত্রে বাঁধা পড়ে তখন খোকা নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের জন্য কেবল আলাদা। *কালো বরফ*-এ রয়েছে '৪৭-এর দেশবিভাগের কাঁটাতারে সৃষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ—যা কখনো শুকোবে না তারই ইতিবৃত্ত। মাহমুদুল হকের জাদুকরি কলমের ছোঁয়ায় *কালো বরফ* হয়ে ওঠে দেশবিভাগের শিকার সকল মানুষের শেকড় হারানোর যন্ত্রণার গল্পগাথা। *মাটির জাহাজ*-এ ছড়িয়ে আছে নারী ব্যবসায়ী জয়নালের মনের গভীরে আচ্ছন্ন থাকা একাকী মানুষের দীর্ঘশ্বাস। অন্যদিকে *খেলাঘর*-এ রয়েছে যুদ্ধসময়ে সম্ভ্রম হারানো নারীর অন্তর্দহনের ভিন্নমাত্রিক উপস্থাপনা। *অশরীরী* ও *পাতালপুরী*-তে আম্বিয়া ও আমিনুল তো সময় আর পারিপার্শ্বিকতার চাপে ডুব দেয় মনের অতলে। একজন মরতে চায় আরেকজন গুটিয়ে নেয় নিজেকে। এসবের মধ্য দিয়ে এই সত্যই উদ ঘাটিত যে কথাশিল্পী মাহমুদুল হকের অন্বিষ্ট ব্যক্তির গভীর নৈঃসঙ্গ্যবোধকে রূপায়ণ করা।

তথ্যসূচি:

---

১ মাহমুদুল হক, "যে ভাষা নিয়ে আমরা খেলছি আজ তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি রক্তস্নাত রাষ্ট্র", লতিফ সিদ্দিকী গৃহীত সাক্ষাৎকার, লতিফ সিদ্দিকী সম্পা., *রোদ্দুর*, ১ম সংখ্যা (নভেম্বর, ১৯৯২), সংকলিত, আহমাদ মোস্তফা কামাল সম্পাদক, *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হক স্মরণে* (ঢাকা : শুদ্ধস্বর, ২০১৩), পৃ.১৩-১৪

২ *তদেব*, পৃ. ১৪

৩ হোসনে আরা কামালী, *মাহমুদুল হকের উপন্যাস: জীবনোপলব্ধির সত্য উদ্‌ঘাটন* (এম.এ. থিসিস, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬) পৃ. ৬

৪ *তদেব*, পৃ. ৮

৫ তপোধীর ভট্টাচার্য, *উপন্যাসের আলো আঁধার* (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪), পৃ. ২১

৬ ঐ, *অনুর পাঠশালা* (৫ম মু.; ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ১০

৭ *তদেব*, পৃ. ১১

৮ *তদেব*, পৃ. ১৮

৯ *তদেব*, পৃ. ১২

১০ *তদেব*, পৃ. ১৪
১১ *তদেব*, পৃ. ১৮
১২ সুব্রত কুমার দাস, *বাংলা কথাসাহিত্যে যাদুবাস্তবতা এবং অন্যান্য* (ঢাকা: ঐতিহ্য, ২০০২), পৃ. ৮৮
১৩ মাহমুদুল হক, *অনুর পাঠশালা*, পৃ. ২৭
১৪ *তদেব*, পৃ. ৪১
১৫ *তদেব*, পৃ. ৫১
১৬ *তদেব*, পৃ. ৪৩
১৭ *তদেব*, পৃ. ৪৫
১৮ *তদেব*, পৃ. ৪৯-৫০
১৯ *তদেব*, পৃ. ৫৩
২০ *তদেব*, পৃ. ৫৬
২১ *তদেব*, পৃ. ৫৯
২২ *তদেব*, পৃ. ৮৭-৮৮
২৩ *তদেব*, পৃ. ৯০
২৪ *তদেব*, পৃ. ৯১
২৫ হোসনে আরা কামালী, পৃ. ৫
২৬ জীবনানন্দ দাশ, "আট বছর আগের একদিন", আবদুল মান্নান সৈয়দ সংকলিত ও সম্পা., *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র জীবনানন্দ দাশ* (১১মু.; ঢাকা: অবসর, ২০১২), পৃ. ১৮৫-১৮৬
২৭ হোসনে আরা কামালী, *তদেব*, পৃ. ৫
২৮ মাহমুদুল হক, "লোভী লোকের দ্বারা গল্প লেখা সম্ভব নয়", প্রশান্ত মৃধা ও হামীম কামরুল হক গৃহীত সাক্ষাৎকার, *আজকের কাগজ*, ঈদ সংখ্যা (অক্টোবর ২০০৩), সংকলিত, *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হকের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, পৃ. ৬২
২৯ ঐ, *নিরাপদ তন্দ্রা* (৪র্থ মু.; ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৮
৩০ *তদেব*, পৃ. ২৩
৩১ *তদেব*, পৃ. ৩৪
৩২ *তদেব*, পৃ. ৮৫
৩৩ *তদেব*, পৃ. ১০২
৩৪ *তদেব*, পৃ. ৮৬
৩৫ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, "সাব অলর্টান কথা বলতে পারে কি?" জিল্লুর রহমান, *আধুনিকোত্তরবাদের নন্দনতত্ত্ব : কয়েকটি অনুবাদ* (চট্টগ্রাম: লিরিক, ২০১০), পৃ.৪৭
৩৬ মাহমুদুল হক, *নিরাপদ তন্দ্রা*, পৃ. ১১২
৩৭ *তদেব*, পৃ. ১২৮
৩৮ মাহমুদুল হক, "যে ভাষা নিয়ে আমরা খেলছি আজ তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি রক্তস্নাত রাষ্ট্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৩৯ ঐ, *জীবন আমার বোন* (৫ম মু.; ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ. ১৪
৪০ *তদেব*, পৃ. ১৬
৪১ *তদেব*, পৃ. ১৭
৪২ *তদেব*, পৃ. ১৫-১৬
৪৩ *তদেব*, পৃ. ২৩
৪৪ *তদেব*, পৃ. ৪৩

৪৫ *তদেব*, পৃ. ৯৬
৪৬ *তদেব*, পৃ. ৪৯
৪৭ *তদেব*, পৃ. ৯২
৪৮ *তদেব*, পৃ. ১৪৭
৪৯ মাহমুদুল হক, "যে ভাষা নিয়ে আমরা খেলছি আজ তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে একটি রক্তস্নাত রাষ্ট্র", পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬
৫০ ঐ, *জীবন আমার বোন*, পৃ. ১৫৭
৫১ *তদেব*, পৃ. ১৫৮
৫২ *তদেব পৃ.*১৫৮
৫৩ *তদেব*, পৃ. ৯৪
৫৪ মো. মেহেদী হাসান, *গুপী-বাঘার ট্রিলজি ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ১২১
৫৫ মাহমুদুল হক, "শিল্পীদের লোভ থাকতে নেই", আহমাদ মোস্তফা কামাল গৃহীত সাক্ষাৎকার, শামীমুল হক শামিম সম্পা., *লোক*, ৯ম বর্ষ সংখ্যা ১১ (নভেম্বর ২০০৭), সংকলিত, *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হকের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার*, পৃ. ৩৭
৫৬ ঐ, *জীবন আমার বোন*, পৃ. ১৫৭
৫৭ কাবেদুল ইসলাম, "জীবন আমার বোন : এক অস্থির সময়ের দলিল", মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ সম্পা., *ঊষালোকে*, ৯ম পর্যায় সংখ্যা ৬ (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১), পৃ. ৪০
৫৮ মাহমুদুল হক, *কালো বরফ*, (২য় মু.; ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০), পৃ. ৩৮
৫৯ *তদেব*, পৃ. ৪৭
৬০ *তদেব*, পৃ. ১২৪
৬১ *তদেব*, পৃ. ১২৬
৬২ *তদেব*, পৃ. ১০১
৬৩ *তদেব*, পৃ. ৬৩
৬৪ *তদেব*, পৃ. ৬৪
৬৫ *তদেব*, পৃ. ২৮
৬৬ *তদেব*, পৃ. ৬৮
৬৭ *তদেব*, পৃ. ৬৭
৬৮ *তদেব*, পৃ. ১২৯
৬৯ *তদেব*, পৃ. ১৩০
৭০ সনৎকুমার সাহা, "মাহমুদুল হক : আমি একা হতেছি আলাদা!", আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পা., *আলোছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ২৯
৭১ মাহমুদুল হক, "শিল্পীদের লোভ থাকতে নেই", পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
৭২ *তদেব*, পৃ. ৩২
৭৩ সরকার আবদুল মান্নান, "মাহমুদুল হকের উপন্যাস : আখ্যান-ভাবনা", আবুল হাসনাত ও অন্যান্য সম্পা., *আলোছায়ার যুগলবন্দি মাহমুদুল হক স্মরণে* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০), পৃ. ১৮১
৭৪ মাহমুদুল হক, *মাটির জাহাজ* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃ. ১৩-১৪
৭৫ *তদেব*, পৃ. ১৭
৭৬ *তদেব*, পৃ. ১২
৭৭ *তদেব*, পৃ. ৪১
৭৮ *তদেব*, পৃ. ৪২

৭৯ *তদেব*, পৃ. ৫০
৮০ *তদেব*, পৃ. ২৮
৮১ *তদেব*, পৃ. ৪৯
৮২ *তদেব*, পৃ. ৬৩
৮৩ মাহমুদুল হক, *খেলাঘর* (২য় মু.; ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৭৯
৮৪ *তদেব*, পৃ. ১০
৮৫ *তদেব*, পৃ. ২৪
৮৬ মাহমুদুল হক, *খেলাঘর*, পৃ. ৫৩-৫৪
৮৭ *তদেব*, পৃ. ৩০
৮৮ *তদেব*, পৃ. ৩৭
৮৯ *তদেব*, পৃ. ৭২
৯০ *তদেব*, পৃ. ৭৬
৯১ *তদেব*, পৃ. ৮০
৯২ *তদেব*, পৃ. ৪১
৯৩ মাহমুদুল হক, *অশরীরী* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৪), পৃ. ৯
৯৪ *তদেব*, পৃ. ২০-২১
৯৫ *তদেব*, পৃ. ২১
৯৬ *তদেব*, পৃ. ৭৯
৯৭ মাহমুদুল হক, *পাতালপুরী* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ২৫
৯৮ *তদেব*, পৃ. ১৫
৯৯ *তদেব*, পৃ. ৬৪
১০০ *তদেব*, পৃ. ১৮
১০১ *তদেব*, পৃ. ১৭
১০২ *তদেব*, পৃ. ২১
১০৩ *তদেব*, পৃ. ৬২
১০৪ মফিদুল হক, "প্রকাশকের কথা", *পাতালপুরী*, পৃ. ৫
১০৫ মাহমুদুল হক, "লোভী লোকের দ্বারা গল্প লেখা সম্ভব নয়", প্রশান্ত মৃধা ও হামীম কামরুল হক গৃহীত সাক্ষাৎকার, *আজকের কাগজ*, ঈদ সংখ্যা (অক্টোবর ২০০৩), সংকলিত, আহমাদ মোস্তফা কামাল সম্পা., *হিরণ্ময় কথকতা মাহমুদুল হকের নির্বাচিত সাক্ষাৎকার* (ঢাকা: শুদ্ধস্বর, ২০১৩), পৃ. ৬৩-৬৪
১০৬ সরকার আবদুল মান্নান, *মাহমুদুল হকের উপন্যাস: আখ্যান-ভাবনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৮